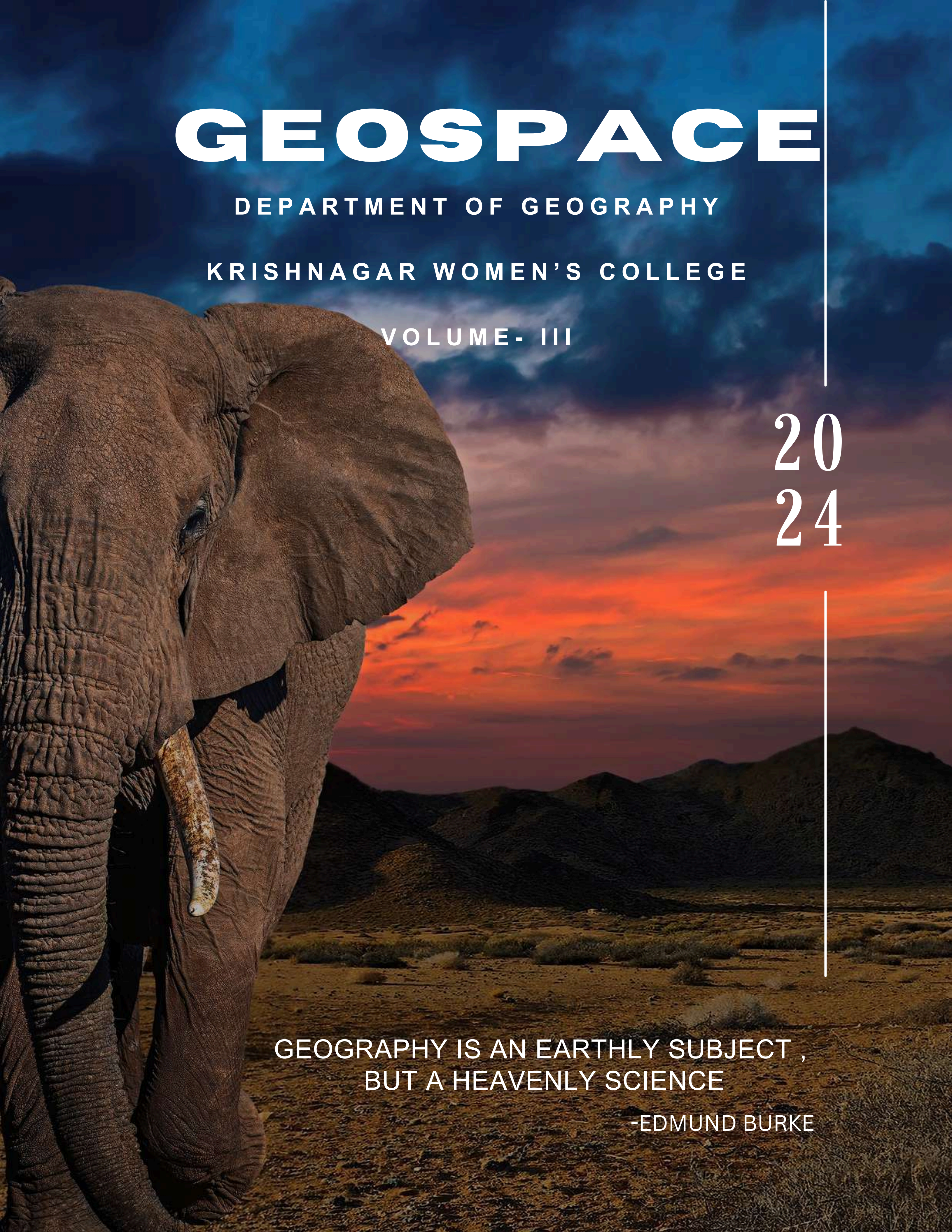

GEOSPACE

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE

VOLUME- III

2024

GEOGRAPHY IS AN EARTHLY SUBJECT ,
BUT A HEAVENLY SCIENCE

-EDMUND BURKE

Message from Principal

Message from Principal
Krishnagar Women's College
Krishnagar,Nadia.

I am glad to know that the Department of Geography, Krishnagar Women's College is going to publish an e-magazine titled " GEOSPACE " on 5th June, 2024. It is a matter of record that the students of this age old department have established their excellence persistently in the field of curricular study. As well, initiatives have taken to enhance their skill for the job market. Moreover, during the last few years, the students of the departments have started a number of co-curricular activities focused on the theme "know your neighbour". They have explored the temporal and spatial societal issues around us, learnt to acknowledge complexity and diversity of the socio-cultural spectrum of the region. I extend my heartiest congratulation to the Faculty, staff and the student of the Department for their tireless effort to foster unity and integrity between " Education" and " Society".

Dr.Natasa Dasgupta
Principal
Krishnagar Women's College

বিভাগীয় প্রধানের কলমে,

অতি আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা **'Geospace'** এর তৃতীয় সংখ্যা আগামী ৫ই জুন, ২০২৪ প্রকাশিত হতে চলেছে। বিভাগের ছাত্রীদের এবং কলেজের সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হতে চলেছে। পত্রিকাটির মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়েছে। এটি ভবিষ্যতে ছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিসরকে আরো বেশি উন্মোচনে সহায়তা করবে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী যা আমাদের ভূগোল বিভাগের যাত্রাপথে একটি অনন্য ফলক হয়ে থাকবে এবং আগামী দিনেও এর মাধ্যমে ছাত্রীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে আরো সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে। আমি নিরলস অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে বিভাগের সমস্ত ছাত্রীদের এবং কলেজের সমস্ত সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাই যাদের নিরলস পরিশ্রমে পত্রিকার তৃতীয় সংকলন প্রকাশিত হতে চলেছে। পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি এবং পরবর্তী সংকলন আরো সমৃদ্ধশালী হবে এই আশা রাখি।

মহঃ ইসরাফিল ধাবক
বিভাগীয় প্রধান
ভূগোল বিভাগ
কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকের কলমে

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের ভূগোল বিভাগের বার্ষিক আন্তর্জালিক পত্রিকা **'Geospace'** এ সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় জানাই এটি আমাদের একটি সমবেত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যার মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের বসতি রূপে পৃথিবী' কে নানা আঙ্গিকে বোঝার এবং লেখার মাধ্যমে তা আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই পত্রিকার ছোট্ট পরিসরে স্থান পেয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, পরিবেশ, পৃথিবীর সম্পর্কে প্রবন্ধ, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং কবিতা.

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই ভূগোল পরিবারের আমার সকল সহপাঠীদের এবং এই মহাবিদ্যালয় এর অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাগনকে যাদের চিন্তাভাবনা লেখার

মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাতে, পত্রিকাটির রূপায়নে আমাদের নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষা নাতাশা দাশগুপ্ত মহাশয়া,

পত্রিকাটি প্রকাশিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাগন শ্রীমতি জয়শ্রী মন্ডল, মোঃ ইসরাফিল ধাবক এবং শ্রীমতি পিংকি হীরা মহাশয়াকে যারা প্রতিনিয়ত আমাদের পথ দেখিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন. আমরা আশা রাখি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সকল পাঠক কে আনন্দ দেবে।

সম্পাদক মন্ডলী:

মহিমা দেবনাথ, 6TH SEM

প্রমিতা রায়, 6TH SEM

রিম্পি রায়, 2ND SEM

জয়িতা মন্ডল,2ND SEM

EDITORIAL BOARD
MAHIMA DEBNATH, 6TH SEMESTER
PROMITA ROY, 6TH SEMESTER
RIMPI ROY, 2ND SEMESTER
JOYEETA MANDAL, 2ND SEMESTER

ADVISORS
Jayasree Mandal
(ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF GEOGRAPHY)
MD Israfil Dhabak
(ASSISTANT PROFESSOR, & Head DEPARTMENT OF GEOGRAPHY)
Pinki Hira
(SACT-I,DEPARTMENT OF GEOGRAPHY)

DESIGNED & COMPOSED BY:
MAHIMA DEBNATH ,6TH SEMESTER

Contents

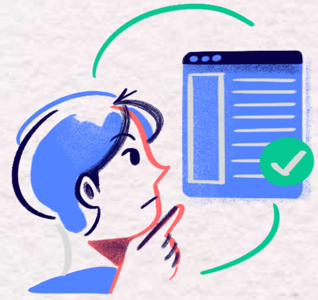

HEAVEN LIGHT ON THE EARTH	1-3	SAMPRITI DAS , 6TH SEMESTER
প্রকৃতির চিহ্ন	4	ANANNYA NANDI , 4TH SEMESTER
যুগের কল	5-6	PRIYANKA SAHA , 6TH SEMESTER
পূর্ব সিকিমে অবিস্মরণীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা	7-8	SRAYITA SAHA , 6TH SEMESTER
ভূগোল বলয়	9	ARPITA GHOSH , 4TH SEMESTER
পরিবেশ নীতিবিদ্যা: প্রাথমিক পরিচয়	10-12	KALPITA NANDI , ASSISTANT PROFESSOR
আমার শৈশবেরচূর্ণী	13-15	PRAKASH CHANDRA MANDAL ASSISTANT PROFESSOR
পৃথিবী হচ্ছেশেষ	16	SATHI PAL , 6TH SEMESTER
A dry tale of India's Silicon Valley: The water crisis in Bengaluru	17-21	PINKI HIRA SACT- I DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
ঝিকমিক	22	PIYASHI GARAI,6TH SEMESTER

সবুজেরঠিকানায়	23	MISHTU DAS , 4TH SEMESTER
জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে জনসচেতনতা	24	Sahana Uyaj Sultana , 4th semester
ঋতু বিভ্রাট	25	SHREYA PANJAI,, 2ND SEMESTER
মেঘের বিভিন্নতা	26-28	MOUMITA BASAK , 6TH SEMESTER
Africa is gradually splitting into two continents and Merge with India	29-32	PRIYA SADHUKHAN , 4TH SEMESTER
সুকাত্রা : ভিনগ্রহের দ্বীপ	33-35	PARAMITA HALDER , 4TH SEMESTER
ভয়ানক পরিস্থিতিতে দেশবাসী	36-37	PIYASHI GARAI , 6TH SEMESTER
পরিবর্তন	38	SAMPI CHOUHAN , 2ND SEMESTR
স্বপ্নের কাঞ্চন	39-40	SAYANI SOMADDER , 6TH SEMESTER
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিওভূগোল	41-44	SRITAMA BISWAS , 6TH SEMESTER

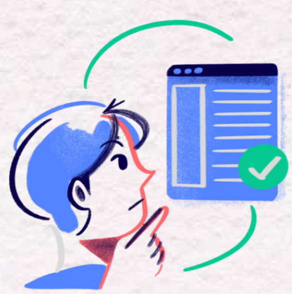

রবির গানে বঙ্গের ঋতুরঙ্গ	45-49	PROMITA ROY , 6TH SEMESTER
বেস্টফ্রেন্ড	50	ANNESHA BHAKAT , 4TH SEMESTER
ছকভাঙা স্বপ্নরা	51-52	MOUMITA NATH , 4TH SEMESTER
CONTRIBUTION OF 10 NOTABLE GEOGRAPHERS IN THE FIELD OFGEOGRAPHY	53-60	PRITHA TALUKDER 6TH SEMESTER
রোহিঙ্গা সম্প্রদায়: রাষ্ট্রহীন এক জাতির উপাখ্যান	61-63	JAYASREE MANDAL ASSISTANT PROFESSOR
প্রকৃতির রুদ্ররোষে হড়পা বান	64-67	MD ISRAFIL DHABAK ASSISTANT PROFESSOR
পরেশের আত্মা	68-69	ANKITA MAJUMDER , 4TH SEMESTER

Photography & Paintings

OUR DEPARTMENT IN NEWS

HEAVEN LIGHT ON THE EARTH

SAMPRITI DAS , 6TH SEMESTER

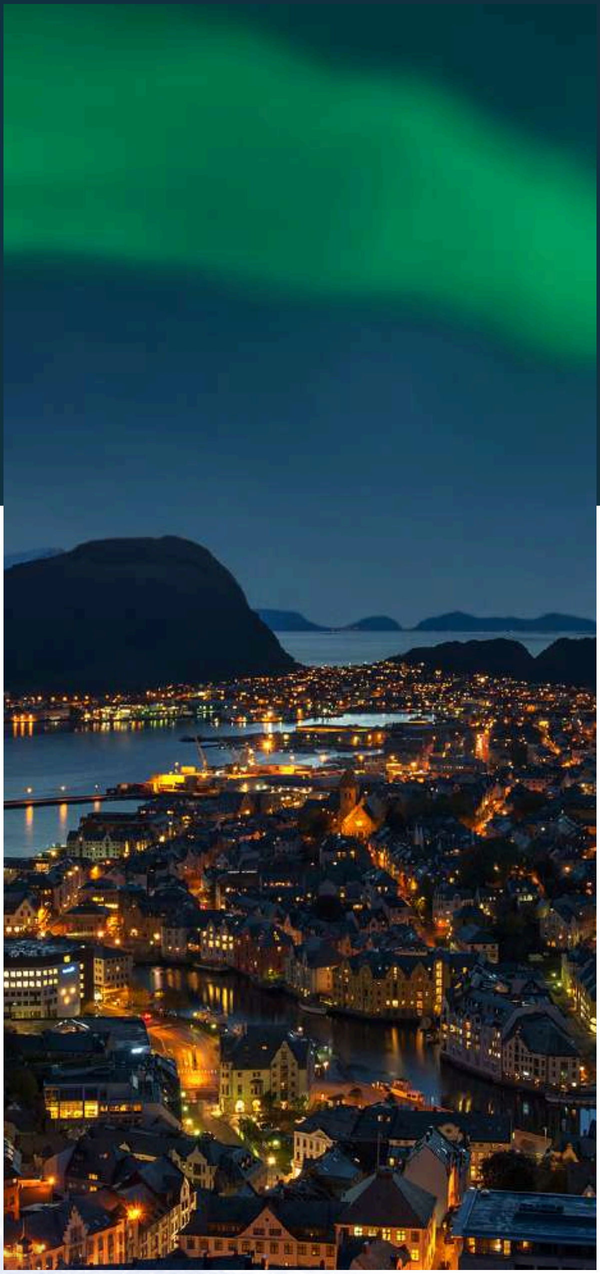

আকাশে আলোর নৃত্য দেখেছেন কখনও? কিংবা মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত? আচ্ছা, যদি পরিচিত নাও হন, Aurora শব্দটা শুনেছেন নিশ্চয়ই? অনেকেই হয়ত ভাবছেন কৃত্তিম আতশবাজির কথা। কিন্তু প্রকৃতি যে আকাশে নিজেই আলোর নাচ দেখায় সে কথা আর কজনেরই জানা আছে? মেরুজ্যোতি আর মেরুপ্রভা এই শব্দেরই বাংলা অর্থ। দুটো একই শব্দ। জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, মেরুপ্রভা কী?

মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা (Polar Aurora) পৃথিবীর দুই মেরুর আকাশে ঘটে যাওয়া এক নৈসর্গিক প্রাকৃতিক ঘটনা। দুই মেরুতে দুই নাম ধারন করেছে, উত্তর মেরুতে একে বলা হয় সুমেরুপ্রভা (Northern Lights/Aurora Borealis) আর দক্ষিণ মেরুতে এরই নাম কুমেরুপ্রভা (Southern Lights/Aurora Australis)। অনেকে আবার একে স্বর্গীয় আলো বলে থাকে।

মেরুজ্যোতি দেখতে অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যাপার মনে হয় বলে প্রাচীনকাল থেকেই মেরু অঞ্চলের বাসিন্দারা (এস্কিমো, ইন্ডিয়ান, আথাবান) একে এক রহস্যময় শক্তি হিসেবে মনে করত। অধিকাংশ মানুষ মনে করত এটি স্বর্গীয় আলো যা স্বর্গ থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীতে এসে শেষ হয়েছে, এই পথ ধরেই মৃত্যুর পরে আত্মা স্বর্গের সন্ধান লাভ করে। অনেকে আবার একে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা মনে করত। সবুজ রঙের প্রভাকে তারা ভাবতো তাদের ভবিষ্যতের সুখের আভাস। আর এর রঙ লাল হলেই তাদের মনে হত ভবিষ্যৎ হবে দুর্যোগময়। লোহিত মেরুপ্রভাকে যুদ্ধের পূর্বাভাস হিসেবেও দেখা হত।

মেরুজ্যোতি, মেরুপ্রভা, আরোরা বা আরোরা অস্ট্রালিস (আরোরা উষা) হল আকাশে একধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী। প্রধানত উঁচু অক্ষাংশের এলাকাগুলোতে আরোরা'র দেখা মিলে। আরোরা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। আরোরা নিয়ে প্রাচীনকালে অনেক উপকথা চালু ছিল।

যেমন নর্স উপকথা অনুসারে আরোরা হল ঈশ্বরের সৃষ্টি সেতু। আবার কিছু কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ আছে যারা মনে করেন তাদের পূর্বপুরুষের আকাশে নৃত্যের কারণে আকাশের রং বদলে যায়। অরোরা নিয়ে মানুষের আগ্রহ প্রাচীনকাল থেকেই। প্রাচীন গ্রীকরা মনে করতো, শেষরাতে এই আলোর ঝলকানি হলো পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া আত্মাদের ছুটে বেড়ানোর দৃশ্য। আবার চীনারা ভাবতো, স্বর্গে ভালো আর মন্দ ড্রাগনের মাঝে মারামারি থেকে ঠিকরে বেরোয় এ আলো। ১৭ শতকে জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি এই আলোর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করলেও শেষতক বেশিদূর এগোতে পারেননি। তিনিই গ্রীকদের ভোরের দেবী 'অরোরা'র নামে এর নামকরণ করেন।মেরুপ্রভা মানুষের নিকট এক চিরন্তন রহস্যের নাম, যা যুগে যুগে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এর রহস্য আধুনিক বিজ্ঞান ভেদ করতে সক্ষম হলেও এর আকর্ষণ কমেনি বিন্দুমাত্র। কমবেই বা কেন? শিল্পীর তুলির আঁচরে সৃষ্ট শৈল্পিক সৌন্দের্যের আকর্ষণ কমে নাকি কখনো? আর শিল্পী যখন প্রকৃতি নিজে, তখন তো কথাই নেই! দূর আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত অদৃশ্য দড়িতে অদৃশ্য এক ক্যানভাস ঝুলিয়ে তাতে নিজের খেয়ালে আঁকিবুঁকি করে প্রকৃতি নামক অদৃশ্য শিল্পী। তবে, অদৃশ্য শিল্পীর অঙ্কন অদৃশ্য থাকে না। এই অঙ্কন সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা নীলকান্তমণির মতো চোখ ধাঁধানো আলোয় জ্বলতে থাকে, দেখা যায় দূর দূরান্ত থেকে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ সহ আরো কত কত বাহারি রঙে রঙিন হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকা বিশাল আলোর পর্দাটি প্রতি মুহূর্তে বদলায় রঙ, বদলে যায় এর আকৃতিও।

অরোরা বা মেরুপ্রভা সৃষ্টির পেছনে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে সূর্য। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, সূর্যে সৃষ্টি হওয়া সৌরবায়ু কোটি কোটি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছুলে সৃষ্টি হয় অরোরা। সূর্য থেকেই শুরু করা যাক। সূর্যের সর্ববহিঃস্থ পৃষ্ঠের নাম করোনা। করোনার তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়, যেখানে খালি চোখে দেখা সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ৫ হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা কিছু ইলেকট্রন , প্রোটন প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হয় সৌরঝড় । এই সৌরঝড় যখন তীব্র শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসতে চায় তখন বায়ুমণ্ডলের ম্যাগনেটোস্ফিয়ার একে বাধা দেয় । ফলে সেই সৌরঝড়ের সব শক্তি ফুরিয়ে আসে এবং আয়নোইজেশন ঘটে , যা রাতের বেলায় দেখা দেয় বর্ণিল আলোকচ্ছটা অর্থাৎ মেরুজ্যোতিরূপে . অরোরা বা মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি পৃথিবীতে সব স্থানে দেখা যায় না কারণ শক্তিসম্পন্ন প্লাজমা কণাগুলো মেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং মেরু অঞ্চলের অণুগুলির সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো আলোকিত ও উত্তেজিত করে এবং ফলস্বরুপ আমরা অরোরা বা মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি দেখতে পাই। এই জন্যই এটি পৃথিবীর সব স্থানে দেখা যায় না শুধু মাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া। মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বা আরোরা বা আরোরা অস্ট্রালিস (আরোরা উষা) হলো আকাশে একধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী। প্রধানত উঁচু অক্ষাংশের এলাকাগুলোতে আরোরা'র দেখা মেলে কানাডার শহর ইয়েলোনাইফ সুমেরু প্রভা দেখার জন্য একটি উপযুক্ত শহর।নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত শীতের দীর্ঘ ও স্বচ্ছ রাতে সুমেরুজ্যোতি সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। গ্রীষ্মের শেষের দিকে এবং শরতের শুরুতেও দেখা মেলে এই মেরুজ্যোতির। সবচেয়ে ভাল দেখা যায় অবশ্য আন্টার্কটিকা ভূখণ্ড থেকে। তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু জায়গা থেকে এই মেরুজ্যোতি দেখা যায় .

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ও মেরুপ্রভাঃ

মেরুপ্রভা নাম শুনেই বোঝা যায় যে এর সাথে অবশ্যই মেরুর সম্পর্ক রয়েছে । আমরা সবাই জানি পৃথিবী এক বিশাল চৌম্বক হিসেবে ক্রিয়া করে। এই চৌম্বকক্ষেত্রের দুই মেরু (Magnetic Poles) কিন্তু ভৌগলিক মেরুদ্বয়ের (Geographic poles) সাথে সমবিন্দু নয় কিন্তু প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করে। ভুচৌম্বকক্ষেত্রের মেরুকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট ডিম্বাকৃতির অঞ্চল তৈরি হয়েছে যেখানে মেরুপ্রভা সৃষ্টি হয়, এ অঞ্চলকে বলা হয় মেরুপ্রভ অঞ্চল (Auroral Oval)। এই অঞ্চলের পরিধিতে উৎপন্ন হয় মেরুপ্রভা .

অরোরাল নয়েজঃ

অনেকেই দাবি করেছেন যে যখন মেরুপ্রভা দেখা যায় তখন এর সাথে মৃদু কম্পাঙ্কের শব্দ শোনা যায়। তবে এ পর্যন্ত এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রমান পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মেরুপ্রভা যেহেতু ভুপ্রিস্থ থেকে অনেক উচ্চতায় সংঘটিত হয় তাই এত উচ্চতায় কোন শব্দ উৎপন্ন হলেও পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে তা শোনার কোন সম্ভাবনা নেই .

Aurora :Where the sky paints its own masterpiece.

প্রকৃতির চিহ্ন

ANANNYA NANDI , 4TH SEMESTER

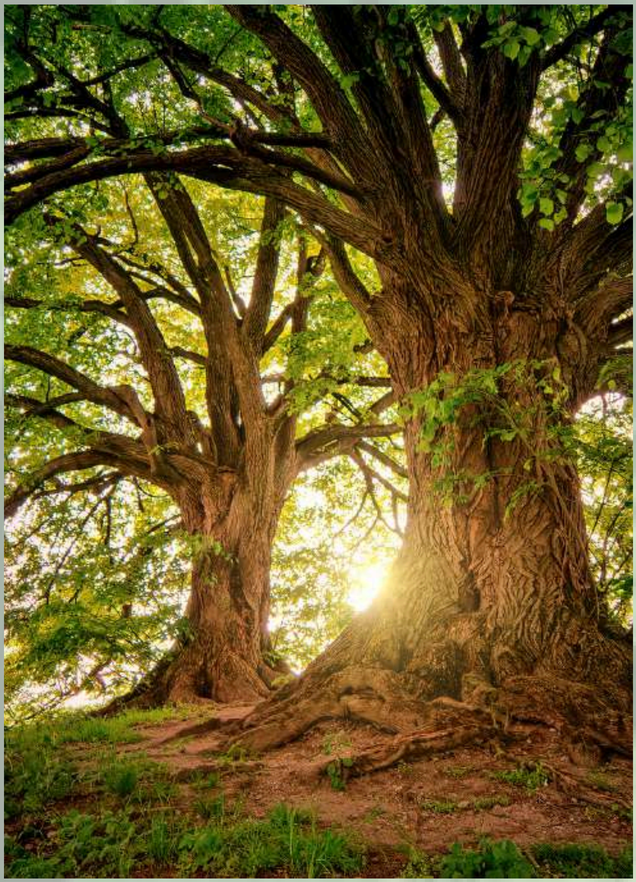

'প্রকৃতি' হল পৃথিবীর সমগ্রসৃষ্টি বা দৃশ্যমান বিষয়, যা নয় মনুষ্য সৃষ্টি।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান কিন্তু, সে বা তারাপ্রকৃতির খেয়াল রাখে কি?

আজ ২১ শতাব্দীতেপ্রকৃতির অস্তিত্ব কোথায়? প্রকৃতি বেঁচে আছে কি?

সে তো এখনমানুষ নিয়ন্ত্রিত অত্যাচারিত বিলুপ্তপ্রায়! প্রকৃতির উপাদান বলতে আজ নদী, বায়ু ,আকাশ ও সূর্যএবং মাটি আর কিছুআছে কি? আমার জানানেই নদী আবর্জনায় জর্জরিতএখন মৃতপ্রায়!

বায়ু যানবাহনের ধোয়ায় অসুস্থ,

আকাশে আজ শুধু ধুলো, জলকণা নেই তাই সেরাগ করে আর বৃষ্টিঝরায় না, সূর্যের প্রখররোদ্দুর থেকে বাঁচার জন্যকোথাও আর গাছের ছায়াদেয়না। ইউভি রশ্মি দুর্বলওজোন স্তর ভেদ করেআসছে রাখছে না সুস্থ

মাটির খোঁজ হয় আজহয়তো পাওয়া যাবে নদীর পাড়ে, আর কোথাও না ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ কংক্রিটে পরিপূর্ণগাছের অভাবে অসুস্থ,

আজ মানুষ তারবিলাস জীবন যাপন করারজন্য বাড়িতে এসে লাগাচ্ছে।

কারণ পৃথিবী অগ্নিকুণ্ডলীরমতো উষ্ণ হচ্ছে !

আজ সবুজের ঠিকানাহারিয়ে গেছে বলেই কিমুছে যাচ্ছে প্রকৃতির চিহ্ন ।।

"প্রকৃতি সেদিন বলল আমায় নয়নভরা জলে ,
আমার সাথে করছোখেলা মৌন থাকি বলে।
মানুষ ভুলে গিয়েছে সৃষ্টিরনিয়ম ধ্বংসের উন্মত্তরা! সবকিছু ধ্বংস হয়ে আমি হয়েছিসারা ।
'প্রকৃতির কথা 'অমৃতাংস।।

যুগের কল

Priyanka Saha , 6th semester

আয়রে তুই আয়রে চলে
আসমানের ওই মায়া ভুলে,
দেখ দেখি তোর চোখটি খুলে
এই পৃথিবীর মানব কুলে।।

ওই যে ওই ছোট্ট কুঁড়ে
দেখ দেখি তুই একটু ঘুরে ,
খিদের জ্বালায় মরছে মানুষ
খাচ্ছে তাঁদের কুড়ে কুড়ে।।

দেখ দেখি ওই ছোট্ট শিশু
জামা প্যান্ট তার নেই যে কিছু ,
কাঁদছে তারা পেটের জ্বালায়
ফুলবাবুদের পিছু পিছু।।

ওই চেয়ে দেখ একটু দূরে
দেখলে যাবেই মাথা ঘুরে ,
কেমন করে খাচ্ছে ওরা
কচুর শাক আর খুদের কুঁড়ে।।

ওই যে ওই একটু দূরে
কাঁদছে যেন বাঁশির সুরে,
খোঁজ নিয়ে দেখ অন্তঃপুরে
সবকিছু তার গেছে পুড়ে।।

দেখরে আবার চোখটি খুলে
চলছে কেমন টলমলিয়ে,
এই সমাজের বিষের নেশায়
সবকিছু আজ গেছে ভুলে।।

ওই চেয়ে দেখ মরণ ফাঁদে
পড়ে তারা কেমন কাঁদে ,
বাঁচার আশা নেই কোন আর
ভরে ওঠে মন বিষাদে।।

ওই শোন ঐ কানাকানি
মুখে যাদের আশার বাণী ,
তারাই আজ মানুষ ভুলে
করছে কত হানাহানি।।

দেখ ফিরে দেখ চোখটি খুলে
অট্টালিকার প্রাসাদ কুলে,
কেমন করে হয় যে এসব
বলনা রে তুই একটু খুলে।।

ওই যে দূরে পুকুর পাড়ে
কাঁদছে বধু করুন সুরে,
জিজ্ঞাসিলে জানবি তারে
গেছে আজি কপাল পুড়ে।।

ওই যে দূরে সর্বনাশা
হাতে নিয়ে যুগের পাশা ,
মরণ ফাঁদের কন্টক এ তার
নিচ্ছে কেড়ে মুখের ভাষা।।

সৃষ্টির এই পাষান বুকে
দেখনারে তুই একটু শুঁকে,
বারুদের গন্ধ কেবল
আর সবই যে গেছে উবে।।

দেখ না রে তুই হেথায় আসি
থেমে গেছে সুরের বাঁশি ,
নিভে গেছে সাঁঝের বাতি
নেই কোন আর শিশুর হাসি।।

ওরে আর নেই যে বাকি
দিস নে তোরা কাজের ফাঁকি,
জোট বেঁধে আয় সঙ্গে তোদের
আসছে এবার প্রলয় ঢাকি।।

মুখে মোদের বিদ্রোহী গান
হাতে রবে অগ্নিবান ,
জিততে হবে আজ দুনিয়ায়
করব মোরা খান খান।।

চল রে সবাই চল রে চল
নব উদ্দমে এগিয়ে চল,
একসাথেতে হানবো আঘাত
পাল্টে যাবে যুগের কল।।

পূর্ব সিকিমে অবিস্মরণীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

SRAYITA SAHA , 6TH SEMESTER

ভ্রমণ করতে কার না ভালো লাগে, আমাদের অনেকের মনে প্রবল ইচ্ছা থাকে অনেক দূরে ভ্রমণ করা। তবে আজকে আমি যে অভিজ্ঞতাটি লিখতে চলেছি সেটা আমার কাছে এক বিশেষ মুহূর্ত, যা আমি এর আগে কখনও অনুভব করিনি। এখনও পর্যন্ত আমর জীবনে আমি শুধু দুইবার ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি; এক আমার পরিবারের সাথে দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়া, দুই যেটা আমার কাছে খুবই বিশেষ সেটি হলো কলেজ ট্রিপ। বন্ধু, স্যার ম্যামের সাথে এই প্রথম আমি বাড়ি ছেড়ে একা পূর্ব সিকিমে ঘুরতে যাই। 6ই ডিসেম্বর, 2023 আমরা তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বিকেলবেলায় নবদ্বীপ ধাম স্টেশন থেকে সবাই রওনা দি।

প্রথমদিন আমরা সিলারি গাওতে ফিল্ড সার্ভে সেড়ে দ্বিতীয় দিন রাস্তার দুধারে পাইন বন দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই রিসিখোলা। শীতের সন্ধ্যা বেলাতে আমরা সবাই বন ফায়ারের চারিদিকে বসে নানারকম খেলার মাধ্যমে উপভোগ করি সময়টি। এর পাশে রিসিখোলা নদীর জলের বয়ে যাওয়ার ছন্দ পরিবেশ টিকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছিল। তৃতীয় দিন আমরা জুলুকের উদ্দেশ্যে রওনা দি এবং একটি হোমস্টেতে বিশ্রাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি বরফ দেখার উদ্দেশ্যে। জিগ জ্যাগ রাস্তা দিয়ে আমরা প্রায় দেড় ঘন্টারমধ্যে পৌঁছিয়ে যাই ওল্ড বাবা মন্দির ও তারপর এলিফ্যান্ট লেক। সেখানে চারিদিকে ছিল বরফে ঢাকা চাদরের মতো আস্তরণ যা আমার জীবনে প্রথম দেখা। আমরা প্রত্যেক বান্ধবী সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে ভুলিনি। সেই হিমাঙ্ক তাপমাত্রায়আমরা বরফ নিয়ে খেলার সময় কখন যে ছোটোবেলায় ফিরে গেছি তা কারোরই হয়তো মনে নেই।

তারপর সেই দৃশ্য মনেরঅন্তরালে ও ক্যামেরাবন্দি করেহোমস্টেতে ফিরে আসি। চতুর্থদিন আমরা আরিতার লেকদেখে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দি ভারাক্রান্তমন নিয়ে। শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড পৌঁছানোর আগে আমাদের চতুর্থ সেমিস্টারের ফলাফল বের হয়, যদিওআমরা সবাই ভালো মতোপাশ করেছিলাম। তারপর আমরা শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডথেকে বাস ধরে 12ইডিসেম্বর, 2023সকাল 6 টায় আমরা কৃষ্ণনগরবাসস্ট্যান্ড আসি, আর সেখানথেকে আমরা যে যারনিজেদের বাড়ি পৌঁছে যাই। সবশেষে এটাইবলতে চাই ভ্রমণের সুযোগহয়তো আমাদের সকলের আসবে, কিন্তু বন্ধুদের সাথে কলেজ ট্রিপের সুযোগ আর হয়তো কখনও ফিরে পাবোনা।

ভূগোল বলয়

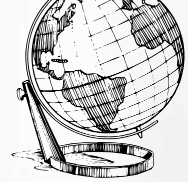

Arpita Ghosh, 4th Semester

জানতে হলে এই পৃথিবী
পড়তে হবে ভূগোল,
নদী কেন চলে এঁকেবেঁকে পথ
আর গ্রহরা কেনো দেয় টহল।

এককালে ছিল সমুদ্র যেথা
আজ দাঁড়িয়ে সেখানে হিমালয়
কীভাবে হল এই অঘটন !
উত্তর মিলবে কোকোরের ব্যাখ্যায়।

কোন মেঘে হবে বৃষ্টি কতখানি
শিশির জমবে কখন ?
কোনটা নিম্বাস কোনটা স্ট্রাট্রাস
কেনো হয় মৌসুমী বায়ুর আগমন।

ভূগোল মানেই কম্পাস- স্কেল
নানান আঁকিবুঁকি,
মানচিত্র জানা চাই ই চাই
তাতে চলবেনা ফাঁকি।

ভূপৃষ্ঠের উপর ভ্রমণ হবে
ট্রোপোগ্রাফিকাল ম্যাপে,
Geological map তোমায় শেখাবে
শিলার বিন্যাস খাপে খাপে ।

ভূগোল বিষয়ের পরিধি ব্যাপক
আছে সব বিষয়ের ছোঁয়া,
পাহাড়,পর্বত,মৃত্তিকা,উদ্ভিদ
যাবে না কোনোটাই বাদ দেওয়া।

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বায়ুমণ্ডল
সর্বত্র তার আনাগোনা,
নিত্য জীবনেও দরকার ভূগোল
তাকে ছাড়া যে চলবেনা ।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা: প্রাথমিক পরিচয়

কল্পিতা নন্দী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর , দর্শনবিভাগ
কৃষ্ণনগর উইমেন্সকলেজ

আমাদেরদৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকট, উভয় সংকট ওসিদ্ধান্তহীনতা অনেক কিছু তুলেধরে - যা নিয়ে আমরা সচরাচর ভাবনাচিন্তা করি না। মানুষেরআচার ব্যবহার মানব, অ- মানব ও পরিবেশের প্রতিদৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম। বর্তমান সময়ে আমরা যে সমস্তসমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার সিংহভাগ দায়প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ ওতার দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ মানুষের বুদ্ধিও নৈতিকতা বোধ অন্যান্য ইতরপ্রাণীর থেকে বহুলাংশেবেশি। এই আলোচনা থেকেআমরা তাই জেনে নেওয়ারচেষ্টা করব বর্তমান সময়েরকতগুলি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্বন্ধে যা আমাদের অস্তিত্বরক্ষার সঙ্গে জড়িত। এই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষকিন্তু সংখ্যালঘু তবু মানুষ অন্যান্যঅ-মানব ও পরিবেশেরউপর রাজত্ব করে চলেছে। এটাকিন্তু খুব একটা গর্বেরবিষয় নয় মানুষ কূলেরকাছে। কারণ আমরা প্রথমথেকে জেনে এসেছি প্রকৃতিও অ-মানব কূলেরসাথে মানুষের সহাবস্থানও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ শিক্ষণীয় ওঅনুকরণীয়। সমগ্র জীব বৈচিত্রের একটিসুনির্দিষ্ট শৈলী আছে। ভারতীয়সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শন কখনোজড়জগৎকে উপেক্ষা করেনি। প্রকৃতিকে প্রাণহীন রূপে নয়, সৃষ্টিও প্রাণ স্পন্দনেরসোপানরূপে গ্রহণ করেছে। এই বসুধা তারঅসীম ধারার নিঃস্বার্থ দানে প্রাণের স্পন্দনকেধরে রেখেছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছেতা নিয়েই পরিবেশ। আকাশ, বাতাস, জল, আলো, মাটি, উষ্ণতা, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সমস্তকিছুর অখন্ডতাই হল পরিবেশ। অর্থাৎপরিবেশ হলো প্রকৃতির উপাদানবিশেষ।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শন প্রকৃতিকে ভোগ লালসা, ধ্বংস বা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, তাকে সুরক্ষা ও স্থিতির যথাযথ ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। শুধু সংরক্ষণ নয় এক চেতনা সম্পন্ন উপলব্ধি ও আত্মিক অনুভবের সম্পর্ক আছে প্রকৃতির সাথে আমাদের - মনুষ্যকূলের। এই উপলব্ধির প্রকাশ আমরা ঋকবেদ যজুর্বেদে ইত্যাদিতে পেয়ে থাকি। আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করি। অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবতা সর্বত্র বিরাজমান। এর উল্লেখ আমরা ঈশোপনিষদ্ এর প্রথম মন্ত্রে পাই। যেখানে বলা হয়েছে, “ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা আবরণীয়।

বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর ফারাক দেখা যায়। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বহুল ব্যবহার প্রাচীন পরিবেশবান্ধব জীবনশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। যে নিঃস্বার্থ দান প্রকৃতি থেকে আমরা পেয়েছি, মনুষ্যকেন্দ্রিকতা স্বার্থকেন্দ্রিকতা ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্ম আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নানা নীতি গৃহীত হচ্ছে কিন্তু পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য তার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে বাস্তবায়িত রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না। প্রকৃতির সংরক্ষণ আমাদের কর্তব্য ও অনস্বীকার্য দায়িত্ব অর্থাৎ শুধুমাত্র নিয়ম-নীতি আইন প্রণয়ন করে নয়। নৈতিক অনুশাসনের অনুশীলন অপরিহার্য। বর্তমানে এই নৈতিক অনুশাসনের বন্ধন অনেকটাই আলগা হয়ে পড়েছে যা মানুষকে অস্তিত্বকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। নৈতিকতার পাঠ ও প্রয়োগ আজ প্রাসঙ্গিক ও অবশ্যস্বীকার্য। পরিবেশ প্রকৃতিকে শুধুমাত্র নিয়ম-কানুনের দ্বারা নয় আত্মিক অনুভব, চেতনা সম্পন্ন পরিবেশ ভাবনা ও নৈতিক অনুশাসনের বন্ধনের দ্বারা সংরক্ষণ করা সম্ভব। শুধুমাত্র ব্যবহারিক মূল্য নয়, স্বতঃমূল্যবান রূপে প্রকৃতির স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে মানুষের অস্তিত্ব সংরক্ষণের ভিত্তি। কারণ প্রকৃতি পরিবেশের উপর মানুষের জীবন ধারণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

নৈতিকতার ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। ১৯৬০ এর দশক থেকে নৈতিকতার ব্যবহারিক দিকের কথা মাথায় রেখে পিটার সিঙ্গার ১৯৮০ সালে প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেসব সমস্যা প্রাসঙ্গিক, যুক্তি সম্পন্ন ও সবার কাছে সমানভাবে সমাদৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে সেই সব বিষয় দর্শনের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিষয়ে বস্তু হিসেবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। ১. প্রাণ নীতিবিদ্যা ২. অমানব প্রাণী নীতিবিদ্যা ও ৩. পরিবেশ নীতিবিদ্যা। প্রথম অংশে মনুষ্যকেন্দ্রিক বা নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর স্বার্থ তাদের স্বতঃমূল্যবান রূপে স্বীকার করা। এবং তৃতীয় অংশে সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি পরিবেশের স্বঃত মুল্যকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে যে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবেশ যা পরিবেশ নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। এই পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল বক্তব্য হল “সম্প্রতি পরিবেশের যে সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, জল দূষণ, এসিড বৃষ্টি ইত্যাদি সংকট থেকে নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে কিভাবে তার সমাধান করা যায় বা লাঘব করা যায় তার সুসংঘবদ্ধ আলোচনা।

অর্থাৎ এমন এক ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যা আমাদের শেখাবে কি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারি প্রকৃতির সংরক্ষণ ও স্থিতির মাধ্যমে। নিঃস্বার্থ রূপে প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহার যেমন আমরা করি অধিকারবোধ থেকে এবং আমরা আমাদের পূর্ব প্রজন্ম থেকে যেভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশকে পেয়েছি তেমন ভাবে না হলেও অপেক্ষাকৃত কম দূষণমুক্ত প্রকৃতি পরিবেশ আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে যাব। এটা আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার আমাদের কাছে।

এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যে ও পশ্চাত্যে বহু বাস্তুতন্ত্রবিদ ও পরিবেশবিদ বহু প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। যেমন অল্ডো লিও পোলড আর্নে নেস প্রমুখ। ভারতীয় দৃষ্টিকোণের পরিচয় আমরা পাই সমকালীন বিভিন্ন দার্শনিক ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে যেমন বেদ, উপনিষদ, পুরান ও মহাকাব্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থিতির কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ নীতি ইত্যাদি বিষয় পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছে। যার মূলে রয়েছে মানুষ ও তার দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন “আত্মানং বিদ্ধি” অর্থাৎ নিজেকে জানো। নিজেকে যথাযথ রূপে জানলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও যথাযথ রূপে জানা যাবে। অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির সাথে বহির্বিশ্বের সামঞ্জস্য বিধান এই ভাবনা প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতার ভাব পরিবেশ তথা প্রকৃতি ভাবনার মূল মন্ত্র। এই পরিবেশ ভাবনা শুধুমাত্র মনুষ্য হিত সাধনের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত মনুষ্যতর প্রাণীকুল, উদ্ভিদ কূল, পরিবেশ তথা সর্ব জীবের অন্তর্ভুক্তি এই পরিবেশ ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রাচীন ঋষিদের বহুল প্রচলিত শ্রুতবচনের প্রার্থনা মন্ত্রে বলা হয়েছে "সর্ব ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।" অর্থাৎ সর্বজীব যেন সুখী হয় সর্বজীব যেন দুঃখ থেকে নিরাময় লাভ করে, সর্বজীব যেন পরম শান্তি লাভ করে কোশমিন কালেও যেন কেউ দুঃখ হোক না করে। সুতরাং আধুনিক, প্রাচীন, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে দৃষ্টিভঙ্গি হোক না কেন তার সারাংশ এই যে মানুষ যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারবে না তাই বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য শুধুমাত্র সেটুকুই প্রকৃতি থেকে আহরণ করা কর্তব্য ততোধিক নয়। এই আহরণ প্রক্রিয়া ধম্ম পদের ৪৯ স্তবকে বর্ণিত আছে যথাযথ ভাবে। মৌমাছি যেমন পুষ্পমঞ্জরীর সৌন্দর্য ও সুগন্ধের কোনরূপ অনিষ্ঠ না করেই তার থেকে সুস্বাদু মধু সংগ্রহ করে। তদ অনুরূপ মানুষের অস্তিত্বের বলবত্তার জন্য অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদানই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্রকৃতির কোনরূপ অনিষ্ট সাধন না করে।

আমার শৈশবের চূর্ণী

প্রকাশ চন্দ্র মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক, , বাংলাবিভাগ
কৃষ্ণনগর উইমেন্সকলেজ

বৈশাখের প্রখর দাবদাহ, অবিরত ঘাম ঝরছে শরীর থেকে। স্কুল এখন গরমের ছুটি ক্লাস এইটের ছাত্র আমি। আমি এবং আরো ৪-৫ জন আমার সমবয়সী বন্ধু আমাদের বাড়ির পাশে আম বাগানে খেলছিলাম এতক্ষন। খেলা শেষে যখন বিশ্রাম নিচ্ছি তখন গরমে ছটফট করছি। অতএব এর সমাধান তো আমাদের হাতের কাছে আছে। আমাদের বাড়ির সামনেই চূর্ণী নদী। স্বচ্ছ নীল জলরাশি তরতর করে বয়ে চলেছে। জল তার শীতল, অতএব দে ছুট আমরা সবাই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি নদীর কূলে জলের মাঝে। এমনি ছিল আমার শৈশব চূর্ণির কূলে। আমাদের বাড়িটি ঠিক নদীর পাশে। আমার মত এই চূর্ণী নদীর তীরবর্তী অসংখ্য গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপনা আপনি এই নদী বক্ষে সাঁতার শিখেছি তার জন্য কোন পেশাদার সাঁতারুদের হাত ধরতে হয়নি, সৌজন্যে আমাদের অতি প্রিয় ,অতি আপন চূর্ণী নদী। দুচোখ অবাক বিস্ময় যখন নদীর কূলে এসে দাঁড়াতাম দেখতে পেতাম অসংখ্য পাল তোলা নৌকা চলেছে কোনটার অভিমুখ পূর্বে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে আবার কোনটার অভিমুখ পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে। অবাক হয়ে দেখতাম অসংখ্য ছোট থেকে বড় নৌকা চলেছে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে। তখনকার দিনে সব থেকে বেশি দেখা যেত নৌকা বোঝায় টালি বাহি জাহাজ। অনেকেই শহরের ছেলেমেয়েরা এই টালি কি হয়তো জানে না। গ্রামাঞ্চলের দিকে এগুলি খুবই অতিপ্রয়োজনীয় বাড়ির ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এবং বড়দের মুখে অবাক বিস্ময় শুনতে পেতাম ‘বলাগর ঘাট’ এই শব্দটি। অর্থাৎ এই টালি গুলি আসতো বলাগর ঘাট থেকে। আবার শীতের প্রারম্ভ হতেই দলে দলে নৌকা, লঞ্চ (যাকে আমরা মোটর চালিত নৌকা বলি) নদীপক্ষে আনাগোনা শুরু হতো মাইক বাজিয়ে। তখন আকাশে বাতাসে একটা পিকনিকের আমেজ ছোট হলেও আমরা অনুভব করতাম। অর্থাৎ নদী ছিল যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম।

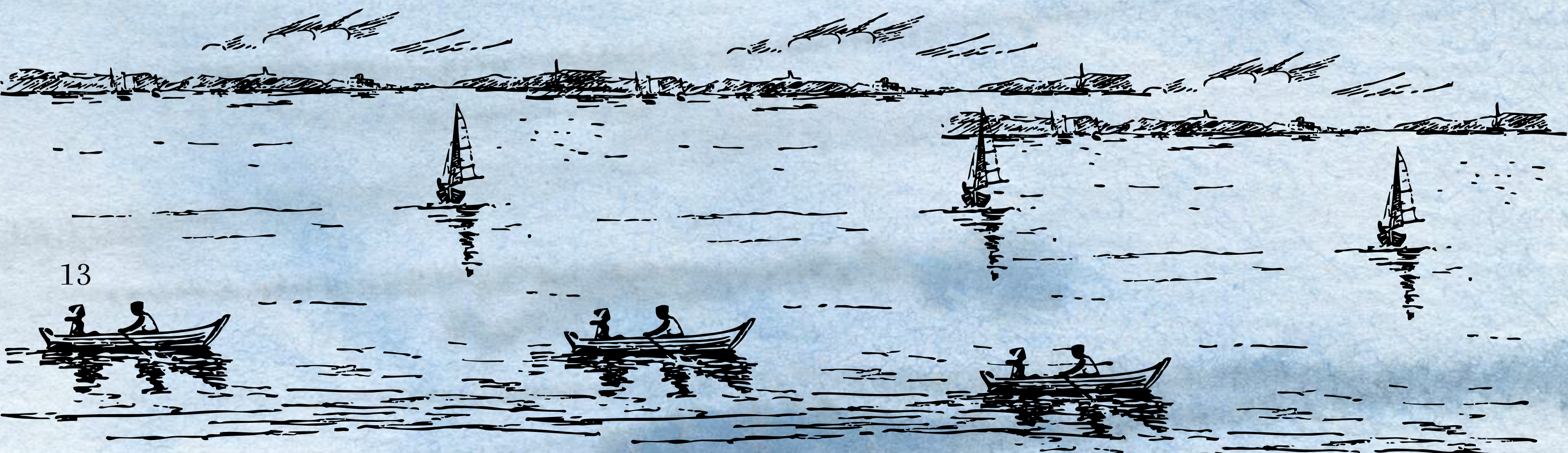

শুধু কি তাই সকাল হলেই নদী তীরবর্তী মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সারাদিনরাত ধরে যে মাছগুলি ধরত সেগুলি বাজারে নিয়ে আসতো। অনেকে আবার ফেরি করত গ্রামে গ্রামে উচ্চস্বরে হাক পেড়ে। অর্থাৎ চূর্ণী তীরবর্তী জনজীবনে মাছের প্রধান উৎস ছিল আমাদের এই প্রিয় নদী। তখনই দেখতে পেতাম আমাদের পাশের গ্রামে অনেক মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তারা সম্পূর্ণ জীবন জীবিকা নির্ভর করত এই নদীর উপর। এবং বিভিন্ন ধরনের দেশওয়ালি মাছ থেকে শুরু করে রুই, কাতল্ বোয়াল এগুলো ধরা পড়তো মৎস্য জীবীদের জালে। আমাদের আশেপাশের সমস্ত গ্রামে ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। ফালত আমাদের এই চূর্ণী ছিল সেই চাষ আবাদের জলের একমাত্র প্রধান উৎস।

এরপর কর্মসূত্রে আমি একটা ডিসট্রিক্ট টাউনে থাকতে শুরু করি। তখন অনেকদিন পর পর গ্রামের বাড়িতে ফিরতে হতো। এবং যখনি গ্রামে প্রবেশ করেছি আমার চোখ আপনা আপনি চলে গেছে চূর্ণির দিকে। দেখে আতকে উঠি ।একি চূর্ণীর জল এত কালো কেন এবং ময়লা জঞ্জালে পুরো চূর্ণী নদীটা পরিপূর্ণ। তখন আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসা করি জানতে পারি যেহেতু চূর্ণীটা বাংলাদেশের ভেতর থেকে আসছে । এবং নদীটি প্রবেশ করছে আমাদের নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট এর মধ্যে দিয়ে তারই অদূরে বাংলাদেশের দর্শনান নামক স্থানে চিনির কলের ধৌত আবর্জনা নদী বক্ষে পড়ছে সেই কারণে চূর্ণির এই অবস্থা। ভাবলাম হয়তো কয়েকদিনে ঠিক হয়ে যাবে।। আবার মাসখানেক পরে একই অবস্থা দেখে গ্রামের লোকের মুখে শুনতে পাই এখন সারা বছর কম বেশি এরকম অবস্থা থাকে। নদীপক্ষে যে বিভিন্ন মাছগুলি পাওয়া যেত সেই মাছগুলো সবই মারা যাচ্ছে। এবং এখন আর নদী বক্ষে কেউ স্নান করে না। এমনও শুনতে পেলাম কিছু গবাদি পশু এই চূর্ণীর জল পান করে তারা ভবলিলা সাঙ্গ করেছে। শুনে বুকের মধ্য কেমন একটা অজানা ব্যথা মোচর দিয়ে উঠলো। মনে পড়ল আমার শৈশবের সেই চূর্ণের কথা। ভাবতেও খারাপ লাগছে পরিবেশ নিয়ে এত চিৎকার চেঁচামেচি বিভিন্ন পাত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শুনি অথচ এই চূর্ণী দুরাবস্থা নিয়ে তাদের কোন হেলদোল নেই।

চূর্ণী তীরবর্তী জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ এই চূর্ণী তাদের পানীয় জল থেকে শুরু করে জীবন ধারণের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। না জানি সেই কোন অনাদি কাল থেকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে গৃহপালিত জীবজন্তু তারা যখন হাঁপিয়ে উঠেছে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চূর্ণের বুকে । চর্নিও তাদের পরম আদরে অবগাহন করিয়েছে গভীর মমতায়। এরপরে পড়াশোনার সুবাদে যখন শহর কলকাতায় থেকেছি, মহানগরের গ্রীষ্মের দাবদাহ আমাকে যখন তিলে তিলে দগ্ধ করছে। তখন চোখ বন্ধ করলেই পরম মমতায় চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আমার শৈশবের অতি আদরের চূর্ণী।

মনে হতো এখনই ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ি চূর্ণির বুকে।

এরপর কর্মসূত্রে আমি একটা ডিসট্রিক্ট টাউনে থাকতে শুরু করি। তখন অনেকদিন পর পর গ্রামের বাড়িতে ফিরতে হতো। এবং যখনি গ্রামে প্রবেশ করেছি আমার চোখ আপনা আপনি চলে গেছে চূর্ণির দিকে। দেখে আতকে উঠি ।

এরপর কর্মসূত্রে আমি একটা ডিসট্রিক্ট টাউনে থাকতে শুরু করি। তখন অনেকদিন পর পর গ্রামের বাড়িতে ফিরতে হতো। এবং যখনি গ্রামে প্রবেশ করেছি আমার চোখ আপনা আপনি চলে গেছে চূর্ণির দিকে। দেখে আতকে উঠি ।

।একি! চূর্ণীর জল এত কালো কেন ?এবং ময়লা জঞ্জালে পুরো চূর্ণী নদীটা পরিপূর্ণ। তখন আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসা করি, জানতে পারি যেহেতু চূর্ণীটা বাংলাদেশের ভেতর থেকে আসছে । এবং নদীটি প্রবেশ করছে আমাদের নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট এর মধ্যে দিয়ে তারই অদূরে বাংলাদেশের ‘দর্শনা ‘নামক স্থানে চিনির কলের ধৌত আবর্জনা নদী বক্ষে পড়ছে সেই কারণে চূর্ণির এই অবস্থা। ভাবলাম হয়তো কয়েকদিনে ঠিক হয়ে যাবে। আবার মাসখানেক পরে একই অবস্থা দেখে গ্রামের লোকের মুখে শুনতে পাই এখন সারা বছর কম বেশি এরকম অবস্থা থাকে। নদীপক্ষে যে বিভিন্ন মাছগুলি পাওয়া যেত সেই মাছগুলো সবই মারা যাচ্ছে। এবং এখন আর নদী বক্ষে কেউ স্নান করে না। এমনও শুনতে পেলাম কিছু গবাদি পশু এই চূর্ণীর জল পান করে তারা ভবলিলা সাঙ্গ করেছে। শুনে বুকের মধ্য কেমন একটা অজানা ব্যথা মোচর দিয়ে উঠলো। মনে পড়ল আমার শৈশবের সেই চূর্ণের কথা। ভাবতেও খারাপ লাগছে পরিবেশ নিয়ে এত চিৎকার, চেঁচামেচি বিভিন্ন পাত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শুনি অথচ এই চূর্ণী দুরাবস্থা নিয়ে তাদের কোন হেলদোল নেই।

ধীরে ধীরে চূর্ণিকে কেন্দ্র করে যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তাদের আজ ভীষণ দুরবস্থা অনেকের জমি জায়গা নেই এটাই ছিল তাদের জীবন জীবিকার উৎস। অনেকে এই দূষিত দলে স্নান করে বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে।

তবুও বিভিন্ন জায়গায় পত্রপত্রিকায় যখন দেখি দূষণ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তখন এক বুক আশা নিয়ে ভাবতে থাকি আমার শৈশবে চূর্ণিরও একদিন এই পাপ থেকে মুক্ত হবে, তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে।

অগ্নি গর্ভ

PAPIYA KAR , 4TH SEMESTER

আজ থেকে প্রায়৭৫ হাজার বছর আগেকার কথা। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন উষ্ণ আদ্রউপভোগ্য আবহাওয়া। তখনকার মানুষ তার প্রথম বিশ্ববিজয়ের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা থেকে দল বেঁধেবেরিয়েছে পৃথিবী ভ্রমণে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এসে থমকে গেলতারা। পূর্ব গোলার্ধ জুড়ে নেমে এসেছে অদ্ভুতআঁধার। দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। চেনা কোনো দুর্যোগেরসাথে মিল নেই। যেপথ ধরে এসেছিল সেপথেই পিছু হটতে হয়েছিলতাদের। কী এমন হয়েছিলআবহাওয়ার সে সময়? তখনতো উষ্ণ যুগ চলছে।আবহাওয়াযথেষ্ট অনুকূল ও উন্নত।হিমযুগ এসেছেআরও পঁচিশ হাজার বছর পরে।তা হলেহঠাৎ কেন এই অন্ধকার! সূর্য উঠেছে না, গরম হচ্ছেনা পৃথিবী, দিন ও রাতেরতফাৎ নামমাত্র ।চাঁদ ও অস্তমিত ।ভূতাত্ত্বিকগবেষণায় জানা যায় এরকারণ দীর্ঘ ঘুম ভেঙে জেগেউঠেছিল সুমাত্রার আগ্নেয়গিরি টোবা। সুমাত্রা থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটারদূরে ছিল এই টোবাপর্বত। দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগতগলিত লাভা বেরিয়ে চলেএবং জমে পাথর হয়।আঠারো লক্ষ বছরে টোবায় চার বার আগ্নেয়গিরিরবিস্ফোরন হয়। কিন্তু বিঞ্জানীদেরমতে এটাই ছিল সবচেয়েভয়াবহ। এতটাই শক্তি যে, পাহাড়ের মাঝখানভেঙে ধস নেমে সেখানে৩,৫০০ র্বগকিলোমিটার বিশালগর্ত তৈরি করে। আজকেরটোবা লেক তারই স্মৃতি।বতর্মানে এই লেক অপূর্বসুন্দর। স্নিগ্ধ এর দৃশ্য। যা বিশ্বের বৃহত্তমআগ্নেয় হ্রদ। মহা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখজুড়েই এর অবস্থান।

আধুনিক মানুষেরপ্রাচীন সভ্যতা বাসা বেঁধে ছিলগ্রীসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের সান্তোরিনি দ্বীপে। সাড়ে তিন হাজার বছরআগে ভয়াবহ অগ্নুৎপাত গোলাকৃতি এই আগ্নেয় দ্বীপ -এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যায় এবংকিছু অংশ সমুদ্রের নীচেচলে গিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চেহারা নেয়। ৩৬০০ বছর আগেমিনোয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এইদ্বীপে এবং অগ্নুৎপাতে দ্বীপেরএকাংশের সঙ্গে সেই সভ্যতা ওহারিয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়াতে ১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়ায়ভয়ানক অগ্নুৎপাতে সারা পৃথিবী জুড়েগ্রীস্মকালীন তাপমাত্রা কমে যায় এবংআবহাওয়ার ওপর যথেষ্ট প্রভাবপড়ে। ২০১৮ সালে ২২ডিসেম্বর ক্রাকাতোয়া আগ্নেয় গিরি আবার জেগেওঠে এবং দ্বীপের একঅংশ ধসে সমুদ্রে পড়ে। ফলে সুনামি আছড়ে পড়ে সুমাত্রার উপকূলেএবং শতাধিক লোকের প্রাণনাশ হয়।

সান্তোরিনিঅগ্নুৎপাত সাড়ে তিন হাজার বছরআগে একটা গোটা দ্বীপেরসভ্যতা মুছে দিয়েছিল,টোবা অগ্নুৎপাত ৭৫ হাজার বছরআগে মনুষ্য সমাজের অভিযাত্রা থমকে দিয়েছিল, রুখেদিয়েছিল মানুষের প্রথম বিশ্ব জয়ের প্রয়াস। আজ ও একঅদৃশ্য ভাইরাস থামিয়ে দিয়েছে অত্যাধুনিক মানুষের গতি। প্রকৃতির এইখামখেয়ালি স্বভাব মানুষ তখন ও বুঝতনা , আজওবুঝতে পারেনি। মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞানেপ্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজের অহংকার আরোপ করে নিজেদেরইসর্বনাশ ডেকে আনছে।

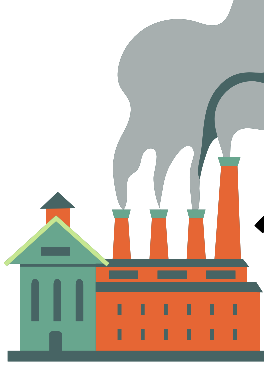

পৃথিবী হচ্ছে শেষ

Sathi Pal, 6th Semester

সারা বিশ্বে একই কথা
কমাও পরিবেশ দূষণ,
কার্যকরী না হওয়ার ফলে
ঘটছে কত দূষণ।

বড় বড় সব কলকারখানা
বাতাসে উড়ায় ধোঁয়া,
রাসায়নিক এর প্রভাব বাড়ে
মাটি হয় ক্ষোয়া।

জলের সাথে প্লাস্টিক এর
হচ্ছে কত লড়াই,
জঙ্গলে ওই গাছের সাথে
হচ্ছে কত বড়াই।

কখনো জল কখনো ঝড়
এই আমাদের দেশ,
কোথাও কম কোথাও বেশি
কোথাও বা সব শেষ।

কখনো ঠান্ডা কখনো গরম
কোথাও বজ্রপাত,
বারে বারে সইছে পৃথিবী
এদেরই যে আঘাত।

তবুও মানুষেরে আঁকড়ে রাখে
নিজের ছেলের মত,
এই ছেলেরাই পৃথিবীর বুকে
করছে আজ ক্ষত।

মানুষ আজ খুশ মেজাজে
চিন্তা নেইকো মনে,
আস্তে আস্তে হচ্ছে শেষ
পৃথিবী তার জীবনে।।

A DRY TALE OF INDIA'S SILICON VALLEY: THE WATER CRISIS IN BENGALURU

PINKI HIRA
SACT, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE

India's Silicon Valley and Tech Hub are some of the names given to Bengaluru, where the information technology sector generates $50 billion annually. Till the start of the summer, the Karnataka government was mooting a Brand Bengaluru campaign to draw more investors. But now the city is grappling with a water crisis.

The city with a 1.40-crore population requires nearly 1,450 MLD (million litres per day) of water from Cauvery and an additional 700 MLD of water from groundwater resources. However, with both sources going dry, several distress calls have been made by industries, institutions and residents who have become victims of the severe water crisis.

Bengaluru, one of India's most populous cities, primarily sources its water from the Kavery river and borewells. However, the wells are drying up as groundwater levels drop amid persistent droughts.

Many residents are now dependent on water from expensive tankers. In recent months, the price of tanker water has risen drastically. Water price inflation reached a point where the government had to step in and cap water tanker prices.

Why does Bangalore face water scarcity?

1. Declining Rainfall and Dwindling Reservoirs:

• Recent monsoons have brought inadequate rainfall to the city, impacting the Cauvery River, a vital water source. Decreased river levels mean less water for drinking and agriculture.

• Karnataka experienced a 38% shortfall in northeast monsoon rains from October to December, along with a 25% deficit in southwest monsoon rainfall from June to September.

• According to the Karnataka State Natural Disaster Management Centre (KSNDMC), key reservoirs in the Cauvery Basin like Harangi, Hemavathi, and Kabini are currently at 39% of their total capacity in 2024.

2. Lack of widespread water utility services in the city:

The BWSSB has still not been able to lay its water pipes in the outer zones of Bangalore. The worst-hit among these are Bellandur, Singasandra, Ramamurthy Nagar, Byatarayanapura, Jakkur, and Devarabisanahalli. These areas are highly dependent on tanker water supply.

3. Non-implementation of water schemes rolled out by the government:

Each government at the beginning of its term claims to be determined to solve the water problem in the city. However, most of the drinking water and sanitation schemes are not able to see the light of the day.

4. High dependency on rainwater:

The major water reservoirs of Krishnaraj Sagar (KRS) and Kabini that feed Bangalore along with other dams and reservoirs in the state have live storage of up to 20% of their capacity. In the given situation, the state has just enough water for drinking to last for one season only.

5. Encroachment into natural water bodies:
The concrete jungle that Bangalore is converting into, is at the cost of its beautiful water bodies. We are now living in our lakes and tanks and are still searching for the natural beauty of the city.
6. Overexploitation of groundwater:
With natural water bodies being encroached, the only source of water available in most parts of the city is groundwater. The population is dependent on it for drinking, washing, and landscape management too. The available water is not reused enough and wasted in drains.
7. Depleting water levels in borewells:
Borewells are now dug as deep as 800-900 feet in search of water. Whereas, a couple of decades ago, it was common to find water at a depth of 150-200 feet.

8. Localized distribution network problem:
In the absence of the water utility services of the government, the population is left with no choice but the use of tanker water. The supply through the tankers is unregulated and mismanaged. The whole channel is unregulated in terms of sourcing, sanitization, availability, and pricing.

9. Failed Monsoon:
The world is undergoing a massive climate change. So is India, Karnataka and of course Bangalore. The major impact of this change is failed monsoons. The city does not get enough rain to recharge its groundwater. The city has already almost exhausted its fossil water reserve. Now the dependency is on rainwater which in itself is scarce.

What can be done?

At the macro level, there are a few initiatives that citizen groups and institutions can take up to reduce wastage of water and promote recharging of groundwater:

● Shift from flood irrigation to micro-irrigation.

About 80% of the freshwater demand comes from the agricultural sector. It is time that farmers do away with the conventional flood irrigation system and switch over to a more efficient drip irrigation process. If it serves as an impetus, drip irrigation has been found to be upto 95% efficient in water application whereas, flood irrigation is only able to manage 40% efficiency. The remaining water is not only wasted, but it also erodes a lot of soil and its nutrients along with it.

● Reuse of sewage water.

We agree that laws have been passed for societies to have sewage treatment plants. But the question to be asked here is, how many actually do so and use it fruitfully? An average nuclear family in Bangalore uses about 150 litres of water per day to flush their toilets. Imagine recycling this water and pushing it back into the flush. Each household would be saving 4500 litres of water just by single reuse. This water can further be used for outdoor washing and gardening purposes as well.

● Filling up of tanks and lakes with treated sewage water.

We need to stop encroaching upon lakes and tanks to create concrete empires. The already encroached water bodies need to be reclaimed and de-silted for viability. While rainwater must be channelized into these lakes, it is a good idea to fill them up with adequately treated sewage water.AZ

● Address Pollution.

Combat water pollution by enforcing strict regulations on industrial discharge, sewage treatment, and agricultural runoff. Implementing wastewater treatment plants and adopting eco-friendly practices can help reduce pollution levels in rivers, lakes, and groundwater sources

● Legislation and Governance.

Strengthen water governance frameworks by enacting and enforcing water related legislation, policies, and regulatory mechanisms. Establishing local, regional, and national water management authorities can facilitate coordinated decision-making and implementation of water management strategies. Introducing minimum support policies for less water-intensive crops can reduce the pressure on agricultural water use.

● Fix the leak.

Last but not the least, fix that leaking faucet, right now. A leaky faucet drains over 500 litres of water while you wait for another weekend to repair it.

References:
https://www.dw.com/en/india-tech-hub-bengalurus-water-crisis-turns-political/a-68961319#:~:text=Bengaluru%20is%20running%20out%20of,issue%20during%20the%202024%20election.
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/bengaluru-water-crisis-cape-town-mismanagement-t-v-ramachandra-9250290/
https://tankerwala.in/8-reasons-for-bangalores-water-scarcity-and-what-can-be-done-about-it/
https://ssbcrackexams.com/wp-content/uploads/2024/03/Bengaluru-Water-Crisis.pdf

ঝিকমিক

পিয়াসী গড়াই, 6th semester

শীতলপাটি বিছিয়ে রবি
গুনতে বসে তারা
খান দশটা গোনার পরে
হয়ে গেলো সারা..
বললো রবি মা কে তার
হতো যদি আকাশ তারাই ভরা
কতই না ভালো হতো
দেখতো সে হাজার খানেক তারা।
শুনে কথা বলো হেসে মা
আগে যখন আকাশ দেখতাম
থাকতো আকাশ তারাই ভরা।
অবাক মনে শোনে রবি
ভাবে কোথায় গেলো তারা!!
বলো এসে বাবা,শোনো তবে বাছা
যায়নি কোথাও তারারা সেথায় আছে যথা যথা।
বাড়ছে দূষণ জমছে ধুলো আকাশে বাতাসে
তাই যায়না দেখা আকাশেতে একটি ও তারা
বাড়ছে দূষণ আলোর ঝলক
কমছে তারার আলোর প্রভাব
করতো আগে আকাশ ঝলমল,এখন করে ভূধর।
একবিংশ শতকের নরনারী মোবাইলেই আসক্ত
ফলে বাড়ছে পাওয়ার, কমছে জ্যোতি
বর্ণহীনতায় ভুগছে তারা,বাড়ছে নানান বিসুখ
তাইতো আকাশেতে যায়না দেখা একটিও তারা!

সবুজের ঠিকানায়

MISHTU DAS,4TH SEMESTER

আজ যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি সেই রাস্তাটা কয়েক বছর আগে আম, কাঁঠাল, শাল, সেগুন গাছে পরিপূর্ণ ছিল, তার সাথে ছিল নানা রংবেরঙের পাখি, কীটপতঙ্গসহ আরও অনেক কিছু। সভ্যতার অগ্রগতিতে ওই গাছগুলো আজ আর নেই । সেগুলি স্থান পেয়েছে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে। আর যে জায়গায় গাছগুলো ছিল , সেখানে তৈরি হচ্ছে বহুতল বাড়ি। ওই গাছের পাখিগুলোর স্থান হয়েছে অন্য কারোর বাসায়। কত কীট পতঙ্গ তাদের নিজের বাসস্থান হারিয়েছে । আজ শুধু হেঁটে চলেছি সবুজ ঠিকানার খোঁজে।

আধুনিকসভ্যতায় জর্জরিত মানুষ নিজেদেরকে আরও আধুনিক করেগড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গাছ কেটে বিস্তরএলাকা কংক্রিটে পরিণত করছে। তারা শখে গাছলাগাচ্ছে বাড়ির ব্যালকনিতে, আর গরম বাতাসথেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরে বসাচ্ছে AC।
এতকিছু ভাবার পর যখন আরোপথ হেঁটে চলেছি তখন অনুভব করলামসবুজ হারিয়ে ফেলেছি। এখন কৃত্রিম গাছকেদেখে প্রকৃতিকে অনুভব করতে হবে ,গরমথেকে রক্ষা পেতে AC বসাতে হবে এবং অক্সিজেনপেতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে। আজ Google Map ও "সবুজের ঠিকানা" নির্ধারণ করতে ব্যর্থ। মনেপড়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরকবিতার কয়েকটি লাইন -

গাছতুলে আনো, বাগানে বসাও
আমারদরকার শুধু গাছ দেখা
গাছেরসবুজ টুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যেরজন্য ওই সবুজের ভীষণদরকার....

জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে জনসচেতনতা

SAHANA UYAJ SULTANA - 4TH SEMESTER

সাম্প্রতিকসময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বহুল আলোচিত ওগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। বলতে গেলে এটিএকটি চব্বিশ শতকের বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ।দিন দিন জলবায়ুর পরিবর্তনজীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাবফেলায় তা আমাদের চিন্তারকারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনিয়ে গবেষণাও চলছে ব্যাপক হারে।

বিভিন্নপ্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হলেও বর্তমান সময়েদেখা যাচ্ছে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কলকারখানা, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস, কয়লা পড়ানো, ইটভাটার ধোঁয়া, গাছ কাটা ইত্যাদিকারণে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

আরোএকটি গুরুতবপূর্ণ বিষয় গাছ কাটা। মানুষনিজ বাসস্থান গড়ার জন্য গাছ কাটছেএর ফলে বনাঞ্চল বংশেরকারণে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের নির্গমন বাড়ছে। বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণবৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্যনষ্ট হচ্ছে।

মানবসৃষ্ট গ্রীনহাউস গ্যাসের ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়নকেজলবায়ু পরিবর্তনের একটা অন্যতম কারণ।এই জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশ নয়ওপরেও প্রভাব ফেলছে। অথচ আমরা সেটাবুঝেও কিছু করছি না।

এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে পরবর্তীকালে আর পৃথিবীতে বাঁচানো যাবে না। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে মরু অঞ্চলে বরফ গলছে এবং বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতা বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে। এর ফলে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধ্বসের মত ভয়ানক সব দুর্যোগ।

আমরা বেশ কিছু সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে কমাতে পারি, জলবায়ুর পরিবর্তন, বাঁচাতে পারি আমাদের পৃথিবীতে। যেমন- গাছ লাগানো বেশি বেশি করে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো, ইঞ্জিন চালিত গাড়ির ব্যবহার কমানো, জন সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে পারি।

এভাবেই আমাদের সকল মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে।

ঋতু বিভ্রাট

SHREYA PANJAY , 2ND SEMESTER

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে মাঝে মাঝে দেখা মিলতো কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া, কোথায়?
কোথায় আজ সে?
আছে তো নাকি এই অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিয়েছে বিদায়??
ভাবলে অবাক লাগে!
কোথায়?
কোথায় সেই দিন?
বর্ষার সেই বৃষ্টি-বাদল দিন?
আছে তো ?
নাকি সেও কালবৈশাখীর মত অভিমানকে সঙ্গ করে নিয়েছে বিদায়?
দুগ্গা ঠাকুর আসে,
সাথে শরৎ নয় বর্ষা নিয়ে আসে।
কি আশ্চর্য!
ঋতুরা কি করছে কাজ তাদের সময় মতো??
নাকী তারাও দিচ্ছে ফাঁকি আমাদের মতো??
হেমন্ত আসে শীত আগমনের বার্তা নিয়ে।

মাঠের নিস্তেজ রোদে হয় নাচ,
মেতে ওঠে সকলের মন হেমন্তের নরম উৎসবে।।
এই তো ভালোই ছিল,
হঠাৎ ঋতুর মন পাল্টে গেল??
শীতের দিনেও হচ্ছে বৃষ্টি
দেখছি বর্ষা দিচ্ছে সব ঋতুতে দৃষ্টি।।
অবশেষে দেখা মেলে বসন্তের।

ঋতুরাজ বসন্ত আনে ফাগুন রঙ
পলাশ রঙে মেতে ওঠে ধরনী।
মেতে উঠি আমাদের প্রাণের উৎসবে
কষ্ট - দুঃখ ভুলে
তবু মনে প্রশ্ন রয় যতো
ঋতুরা কি করছে কাজ তাদের সময় মতো???

মেঘের বিভিন্নতা

MOUMITA BASAK , 6TH SEMESTER

আকাশ মানেই বিশালতা, নীরবতা এবং যার শেষ বলে কিছু নেই। আকাশের ভিন্নতা আমাকে সবসময় মুগ্ধ করে চলেছে। যখনই আকাশের দিকে নজর পড়ে মন আনমনা হয়ে যায় এবং এর বিশালতা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আকাশের দিকে তাকালে পুরো আকাশ জুড়ে যা দেখা যায় তা হল মেঘ। প্রকৃতির দ্বারা আমরা সবাই বেষ্টিত আর প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিস নিয়ে গঠিত তা সর্বদাই কৌতূহলপূর্ণ। প্রকৃতির এমনই একটি অংশ হল মেঘ যা নিয়ে আমাদের অনেকের কৌতূহল রয়েছে। বিকেলে ছাদে পায়চারি করার সময় হোক বা যেকোনো সময়, দিগন্ত থেকে উঠে আসা পাহাড়ের মতো উঁচু কালো মেঘ কিংবা পালকের মতো হালকা সাদা মেঘ কখনো বা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ – এসব দৃশ্য কে না দেখেছে! সারাবছর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেঘের সৃষ্টি হয় আবার তা মিলিয়েও যায়।

বায়ুমন্ডলে ভাসমান ক্ষুদ্র জলকনার সমষ্টি হল মেঘ। ভূমিভাগ থেকে যথেষ্ট উচ্চতায় অবস্থিত, জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সৃষ্ট, বায়ুমন্ডলে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম জলকনাকে মেঘ বলে।

১৯৫৬ সালে WMO একটি আন্তর্জাতিক মেঘ মানচিত্র (International Cloud Atlas) প্রস্তুত করে,যেখানে উচ্চতা ও বৈশিষ্টের ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের মেঘকে ১০টি ভাগে ভাগ করা যায়।আবার উচ্চতা অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ্য করা যায়। যথা – উচ্চ আকাশের মেঘ, মধ্য আকাশের মেঘ, নিম্ন আকাশের মেঘ।

● উচ্চ আকাশের মেঘ (৬-১২কিমি) :

সিরাস : সিরাস মেঘ আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে এবং সাদা পালকের মতো দেখতে হালকা প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশ করে। সূক্ষ্ম তুষার কনা দিয়ে এই মেঘ গঠিত বলে একে অশ্বিনী পুচ্ছ বলে।

সিরোস্ট্র্যাটাস : স্বচ্ছ সাদা বর্ণের এই সিরোস্ট্র্যাটাস মেঘ পাতলা সাদা চাদরের মতো পুরো আকাশকে ঢেকে রাখে এবং আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়।

সিরোকিউমুলাস : আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ সকলেই দেখেছি যা কিনা সিরোকিউমুলাস নামে পরিচিত। সূর্যাস্তের সময় এই মেঘ লাল বর্ণকে প্রতিফলন করে তাই আকাশকে লাল বর্ণের দেখায়। এই মেঘযুক্ত আকাশকে MAKERAL SKY বলা হয়।

● মধ্য আকাশের মেঘ (২-৬কিমি):

অল্টোকিউমুলাস : পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশকারী এই অল্টোকিউমুলাস মেঘ ঢেউ বা রেখার আকারে সজ্জিত থাকে। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হয় এই মেঘ থেকে।

অল্টোস্ট্র্যাটাস : বিরাট অঞ্চল জুড়ে অনেকক্ষন বৃষ্টি হয় এবং ধূসর চাদরের মতো সারা আকাশ জুড়ে ভেসে থাকে এই অল্টোস্ট্র্যাটাস মেঘ।

● নিম্ন আকাশের মেঘ (০-২কিমি):

স্ট্র্যাটাস : কুয়াশার মতো দেখতে ধূসর বর্ণের এই স্ট্র্যাটাস মেঘ থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়। আকাশকে চাদরের মতো ঢেকে দেয় বলে অস্পষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হয়।

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস : আকাশে যে উজ্জ্বল, ভারী ঘন মেঘ দেখা যায় তা হল স্ট্র্যাটোকিউমুলাস মেঘ। শীতকালে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ভিন্ন স্থানে সাদা ধূসর বর্ণের মেঘটি প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

নিম্বোস্ট্র্যাটাস: যে মেঘ থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়,তবে বৃষ্টিপাত হলেও বজ্রপাত বা শিলাবৃষ্টি হয় না সেই গাঢ় ধূসর, খারাপ আবহাওয়া নির্দেশকারী মেঘ হল নিম্বোস্ট্র্যাটাস।

অনেক সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফুলকপির মতো আকৃতিবিশিষ্ট একধরণের ভাসমান মেঘ,যাকে কিউমুলাস মেঘ বলা হয়। এই মেঘ উল্লম্বভাবে বিস্তৃত এবং গম্বুজাকৃতির। এটি একধরণের পরিচলন মেঘ। পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশকারী এই মেঘ থেকে দিনের বেলা কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টি হয়। সর্বশেষ যে মেঘের কথা বলব তা হল কিউমুলোনিম্বাস মেঘ। গম্বুজাকৃতি এই মেঘের তলদেশ সমতল হয়ে থাকে। প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হয় বলে একে Thunder Cloud বলে। এই মেঘের বিস্তার উল্লম্ব প্রকৃতির। এই মেঘ দেখলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে পরবর্তী আবহাওয়া খারাপ হতে চলেছে অর্থাৎ ভারী বৃষ্টিপাত বা শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

AFRICA IS GRADUALLY SPLITTING INTO TWO CONTINENTS AND MERGE WITH INDIA

Priya Sadhukhan (4th sem)

The idea of East Africa merging with India has been around for decades. The theory is based on scientific evidence and is supported by geologists and geophysicists. This theory is based on the movement of tectonic plates that are slowly pulling East Africa apart and the Indian Plate moving northwards towards the Eurasian Plate.

A large crack, stretching several kilometres, made a sudden appearance recently in south-western Kenya. The tear, which continues to grow, caused part of the Nairobi-Narok highway to collapse. Initially, the appearance of the crack was linked to tectonic activity along the East African Rift.

The East African Rift Valley stretches over 3,000km from the Gulf of Aden in the north towards Zimbabwe in the south, splitting the African plate into two unequal parts: The Somali and Nubian plates. Activity along the eastern branch of the rift valley, running along Ethiopia, Kenya and Tanzania, became evident when the large crack suddenly appeared in south-western Kenya.

The Earth is an ever-changing planet, even though in some respects change might be almost unnoticeable to us. Plate tectonics is a good example of this.

The Earth's lithosphere (formed by the crust and the upper part of the mantle) is broken up into a number of tectonic plates. These plates are not static, but move relative to each other at varying speeds, "gliding" over a viscous asthenosphere. Exactly what mechanism or mechanisms are behind their movement is still debated, but are likely to include convection currents within the asthenosphere and the forces generated at the boundaries between plates.

What are the Factors Responsible for Africa's Rifting Plates?

The three plates — the Nubian African Plate, Somalian African Plate and Arabian Plate — are separating at different speeds.

The Arabian Plate is moving away from Africa at a rate of about an inch per year, while the two African plates are separating even slower, between half an inch to 0.2 inches per year.

In the past 30 million years, the Arabian Plate has been gradually moving away from Africa, which has already led to the creation of the Red Sea and the Gulf of Aden.

Current Situation:

While the rifting process has been occurring for some time, the potential division made headlines worldwide in 2018 when a large crack emerged in the Kenyan Rift Valley. How long before Africa is divided?

Not anytime soon. It will take millions of years for Africa to be sliced into two unequal parts. The new ocean will take at least 5 million to 10 million years to form which could eventually give the landlocked countries of Uganda and Zambia their own coastlines.

The smaller continent created by the rift will include countries such as present-day Somalia and parts of Kenya, Ethiopia, and Tanzania.

East Africa merging with India

The idea of East Africa merging with India has been around for decades. This theory is based on the movement of tectonic plates. While the possibility of East Africa merging with India is based on geological and geographical factors, it is not likely to happen anytime soon. The movement of tectonic plates is a very slow process, and the merging of these two land masses will take millions of years. If East Africa merges with India, it will create a new landmass that will be a combination of Africa and Asia. Scientists say Africa is peeling apart into two parts that will eventually lead to the formation of a new ocean. While the process will take millions of years to complete, this will

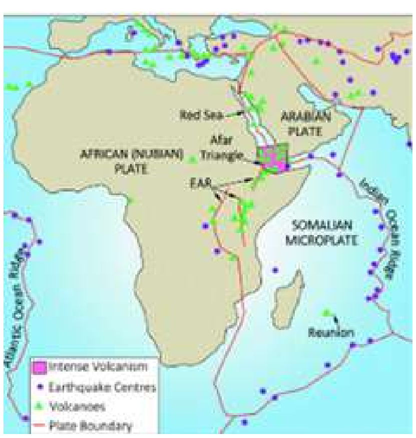

split present-day Somalia and parts of Kenya, Ethiopia, and Tanzania from the rest of the continent.

This idea, known as the East African Rift System-Indian Plate boundary hypothesis, is based on several lines of evidence, including geophysical data, geological observations, and computer modeling.

The crust is made up of several large plates that are constantly moving and interacting with one another. Where two plates meet, they can either move apart (divergent boundary), move towards each other (convergent boundary), or slide past each other (transform boundary). The East African Rift System is a divergent boundary, where the African Plate is slowly pulling apart into two separate plates

The Indian Plate, on the other hand, is moving northward and is currently colliding with the Eurasian Plate, resulting in the formation of the Himalayan Mountains. However, some geologists believe that the Indian Plate may eventually shift its direction of movement and start moving towards the east, towards the East African region. If this were to happen, the Indian Plate could collide with the Somali Plate, creating a new mountain range and potentially causing the continent to break apart. The Indian Plate is moving northwards towards the Eurasian Plate at a rate of about 5 centimetres per year. As the Indian plate moves northward, it will eventually merge with the East African plate (also known as the Nubian plate), resulting in significant geological and geographical changes. Although the collision between the Indian and East African plates is an ongoing geological process, it will take millions of years for the two plates to completely merge.

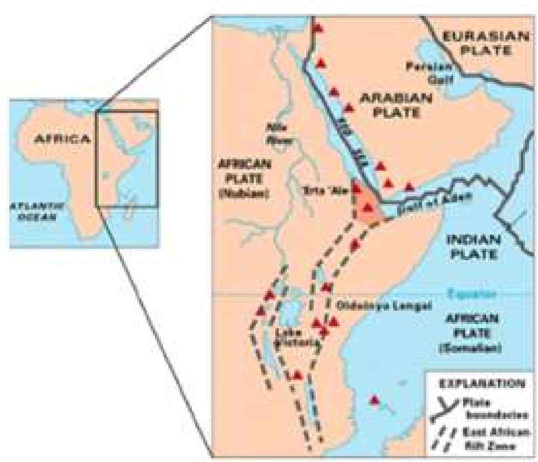

The merging of East Africa with India will have a significant impact on the climate of the region.

Displacement and Habitat Loss: Displacement of communities, settlements, and habitat loss of various flora and fauna are consequences that will lead to environmental degradation.

The necessary evacuation of people and the potential loss of lives will be an unfortunate cost of this natural phenomenon.

As of 2015, more than 15 million people were internally displaced in Africa, according to the United Nations Environment Programme report on displacement and environment.

The emergence of new coastlines will unlock for economic growth in countries. That will have access to new ports for trade and subsea internet infrastructure.

conclusion

For us this study life time opportunity to wideness real facts. This is the only place on Earth where you can study how a continental rift becomes an oceanic rift. The idea of East Africa breaking up and merging with India is based on scientific evidence and is a real possibility. The merging of these two landmasses will have a significant impact on the world's geography, climate, and biodiversity.

সুকাত্রা : ভিনগ্রহের দ্বীপ

Paramita Haldar, 4th semester

পৃথিবীর বুকে এখনো যেঅনেক রহস্যময় ও আশ্চর্যজনক স্থানরয়েছে তা নতুন করেবলার অপেক্ষা রাখে না। তেমনইঅদ্ভুত একটি স্থান হলোসুকাত্রা দ্বীপ। এখানে তেমন অদ্ভুত ঘটনাঘটেনি তবে দ্বীপটি নিজেইঅদ্ভুত রহস্যে ভরপুর। এখানকার জীবজগৎ, প্রাণীকূল অন্য কিছুর সাথেইপৃথিবীর অন্য জায়গার তেমনমিল নেই। যেমন অদ্ভুতদর্শনের উদ্ভিদকুল তেমনই অদ্ভূত পশুপাখি। এখানকার সবকিছুই এত অদ্ভুত দর্শনেরযে এই দ্বীপটিকে ভিনগ্রহেরকোনো জায়গা বললে মোটেই ভুলহবে না। আরব সাগরেরমাঝে এমনই এক দ্বীপঅবস্থিত আছে যেখান এলিয়েনদেরদেখা না মিললেও ভৌগোলিকপরিবেশ এবং গাছপালার কারণেইএকে এলিয়েন দ্বীপ বলা হয়।

আরবসাগরের বুকে মাথা তুলেদাঁড়িয়ে থাকা সুকাত্রা পুরোপুরিএকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সুকাত্রাকে দ্বীপ বললে ভূল বলাহবে, আরব সাগরের বুকেদাঁড়িয়ে থাকা সুকাত্রা একটিদ্বীপপুঞ্জ যা মোট চারটিদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত; সেগুলি হলো - সুকাত্রা,আব্দ আল কুরি, সামহা, দারসা । এর মধ্যে সুকাত্রাসব থেকে বড়। 3796 বর্গকিমিআয়তন বিশিষ্ট,সুকাত্রা দ্বীপের দৈর্ঘ্য 132 কিমি, প্রস্থ 50 কিমি।সুকাত্রা দ্বীপে মূলত উষ্ণ মরুআবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। এখানকারগড় তাপমাত্রা 25°C । এখানে বছরেখুব কমই বৃষ্টিপাত হয়, তবে তার কোনো নির্দিষ্টসময় সীমা,নেই সারাবছরইঅনিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত হয়। তবে অক্টোবরথেকে ডিসেম্বর এখানে 800mm বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জুনথেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিন - পশ্চিম মরশুমে দমকা বাতাসের কারণেএখানকার সমুদ্র উত্তাল থাকে।

কয়েকলাখ বছর ধরে সুকাত্রা দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। যেকারণে এখন জন্মানো উদ্ভিত ও প্রাণীকূল সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র এবং ব্যতিক্রমী চেহারা পেয়েছে। দ্বীপটিকে এলিয়েন দ্বীপ বলার পেছনে মূল কারণ হলো এখানকার গাছপালা। এই দ্বীপে যেসব উদ্ভিদ রয়েছে তা নামে যেমন অদ্ভুত, দেখতেও তেমন। দ্বীপটির বেশিরভাগ উদ্ভিদই স্থানীয় অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য কোথাও এইসব উদ্ভিদের দেখা মেলে না। সুকাত্রার উদ্ভিদ প্রজাতি 37% যা বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই দ্বীপের সবচেয়ে অদ্ভুত গাছের একটি হলো ড্রাগন ব্লাড ট্রী । এটির বিশাল আকৃতির ছাতার ন্যায় রূপ।এই গাছটি প্রায় 32 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গাছের কাণ্ড ওপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে পেতে অসংখ্য ডাল পালায় ভাগ হয়ে যায়। ডাল গুলোর ঘনো পাতার কারণে গাছটি দেখতে ব্যাঙের ছাতার আকৃতির। ছাতা আকৃতির এই গাছ থেকে লাল বর্ণের একধরনের আঠালো পদার্থ বের হয় যা সাধরনত রং তৈরি ও বার্নিশ এর কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে 'Dendrosicyos socotranus' ।

এই গাছটি বিভিন্ন আকৃতির কাণ্ড নিয়ে চুড় তৈরি করে। এই গাছটি একপ্রকার উভলিঙ্গ প্রকৃতির উদ্ভিদ। এছাড়া রয়েছে Aloe perryi, and Boswellia socotrana। এসব ব্যতিক্রমী উদ্ভিদের জন্যই দ্বীপটিকে ভিনগ্রহের দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করার মূল কারণ। তবে দ্বীপটিতে মানুষের বসবাস ও জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এধারা চলতে থাকলে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

অদ্ভুত আকৃতির উদ্ভিদ ছাড়াও মোট 31 প্রজাতির প্রাণী দেখা যায় এই দ্বীপে যার 94% অর্থাৎ 29 টি প্রজাতি স্থানীয় অর্থাৎ যা সারা বিশ্বে অন্য কোথাও দেখা যায় না। পাখির মধ্যে রয়েছে ' Socotra Starling ' , ' Socotra Sparrow ' সহ বেশ কিছু স্থানীয় প্রজাতির পাখি। এছাড়া টিকটিকি, নানা প্রকারের মাকড়সা, সাপ কাকড়া, প্রজাপতি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বাদুর দেখা যায়।

গবেষকদের মতে 2000 বছরের বেশি সময় ধরে মানুষের বসবাসের ফলে স্থানীয় পরিবেশে এর কিছু প্রভাব পড়েছে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে কুমিরের মতো অনেক প্রাণী। জ্বালানীর প্রয়োজনে হারিয়ে গেছে বহু উদ্ভিদ।

ভয়ানক পরিস্থিতিতে দেশবাসী

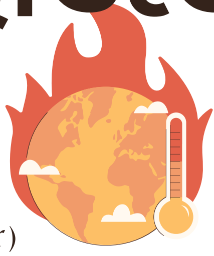

-**পিয়াসী গড়াই** (6th semester)

এই তপ্ত গরমে আমাদের সকলেরই অবস্থা প্রায় নাজেহাল হয়ে উঠেছে। তাপপ্রবাহ শব্দটির সাথে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত হয়ে উঠেছি। বর্তমানে তাপপ্রবাহ একটি জরুরী কালীন পরিস্থিতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে । যখন কোন অঞ্চলের উচ্চ বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ বিরাজ করে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু চলাচল করতে পারে না এবং অধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখন অনেকের মনে ধারণা হতে পারে, তাপপ্রবাহের ফলে যে গরম তা কাটানোর জন্য আমরা ফ্যান,এসি,কুলার ব্যবহার করে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারি কিন্তু এগুলি ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনো কয়লা বা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে করা হয়ে থাকে যার ফলে পরিবেশের CO_2 পরিমাণ বেড়ে যায় এবং গ্রীন হাউস প্রভাবে পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।এসি একটি তৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান হলেও এটি একটি দীর্ঘকালীন বিপদের সম্ভাবনা।

গরমের প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিকে পিছনে ঠেলে দেয়। ভারতের ৭৫ শতাংশের অধিক মানুষ শ্রম নিবিড় যেমন চাষবাস,বাড়িঘর নির্মাণ, ফেরিওয়ালা কাজের সাথে যুক্ত। অতিরিক্ত গরম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন কম হয় এবং খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ভারতের এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন ৭৫% মানুষের উপর নির্ভর। কিন্তু গরমের ৫ - ১০% উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের কম উৎপাদনশীলতার প্রভাব জিডিপিতে 2.5-4.5 % হবে, অর্থাৎ প্রতি বছর ভারতকে ১২৬ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি সম্মুখীন হতে হবে । যারা কোন একটি সেক্টরে কাজ করে অথবা ছাত্র-ছাত্রী যারা পড়াশোনা কাজে নিয়োজিত তারা তাপপ্রবাহের সাথে সম্মুখীন হয় কেবল যাতায়াতের সময়,mckinsey এর তথ্য অনুসারে কুড়ি কোটি জনসংখ্যা তাপপ্রবাহের স্বীকার।

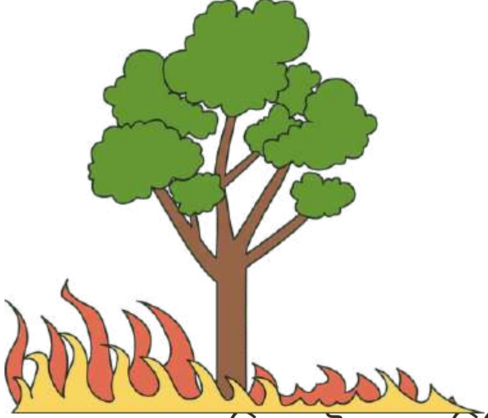

ন্যাশনাল ডিজাস্টার অথরিটি তথ্য অনুসারে ১৯৯২ সালে তাপপ্রবাহের ফলে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬১২ যেটা ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৪০। ভারতের তাপ প্রবাহ বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ হলো পাশ্চাত্যের অনুকরণ ।আমাদের খুব শীঘ্রই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা বন্ধ করা উচিত। এখন অনেক ইমারতের কাচের দেওয়াল দেখা যায়, পাশ্চাত্যের জলবায়ু অনুসারে সেখানে কাচের দেয়াল যথাযথ হলেও ভারতের মতন উষ্ণ দেশের কাচের দেওয়াল যথোপযুক্ত নয়। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ডবল সান ইফেক্ট দেখা যায় ফলে উষ্ণতা দ্বিগুণ হয়। এছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে নির্বিঘ্নে গাছ কাটার ফলে হিট আইল্যান্ড গঠিত হচ্ছে। গরমের প্রভাব কমাতে হলে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, অধিক পরিমাণ জলপান করতে হবে, জলের যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং অধিক থেকে অধিকতর গাছ লাগাতে হবে। তবে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইউক্যালিপটাস গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কাঠে ঘুন ধরে না বলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার আশায় ইউক্যালিপটার গাছ রোপন করে থাকে,এবং এই গাছের চারা অনেক ক্ষেত্রে সস্তাও হয়। ইউক্যালিপটাস গাছের শিকড় অনেক গভীর পর্যন্ত যায় এবং গভীরে জল শোষণ করে গাছের কান্ডে পাতায় ফলে মাটি মরুভূমির মতন রুক্ষ হয়ে যায়। এই গরমে আমরা সকলেই আম লিচু কাঁঠাল এগুলো খেয়ে থাকি এবং এর বীজগুলো সংরক্ষণ করে বর্ষাকালে রোপন করতে পারি। আগামী গরমে কিছুটা স্বস্তি না পেলেও বছর পাঁচেক পর গরমে এই তীব্র দাবদাহের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে।পৃথিবীর মধ্যে ভারতে বনভূমির পরিমাণ মাত্র 1.75%। FAO এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতে ১৫ লক্ষ হেক্টর অরণ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।পতিত জমিতে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে সকল জনসাধারণ কে,নতুবা আসন্ন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতে চলেছে দেশবাসীরকাছে।

বৃক্ষ লাগাই ভূরি ভূরি তপ্ত বায়ু শীতল করি।
ফলবৃক্ষ করব চাষ, কাটব না আর একটি গাছ
সকল কাজে বারো মাস,তাই বর্ষাকালে লাগাই গাছ।

পরিবর্তন

সম্পী চৌহান, 2nd Semester

কিছু কিছু পরিবর্তনহয়ে গেলেও গত
রয়ে যায় তারদেওয়া সেই দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত।
যেমন দেখো আমাদেরবর্তমানের এই গ্রীষ্ম
বলতে পারি নিত্যদিনইকরে চলেছে ভষ্ম।
চেষ্টা করলেই ক্ষতটা করা যায় নিরাময়
তার জন্য রয়েওছেবিভিন্ন ধরনের উপায়।
গাছ বাঁচাও, গাছলাগাও,AC ব্যবহার করো
কম
নইলে এভাবেই হতেথাকবে উষ্ণতাদের
সমাগম।

আমাদের ছোট্ট শরীরের সেই রূপটি
আজকে তারও পরিবর্তনঘটে গেছে খুবই।
পরিবর্তন তো সময় ছন্দেকরেই চলে এই
ছলনা,
তুমিও চলো এরই তালে,রেখোনা কোনো
অনুশোচনা।
পরিবেশই করতে শেখায় তারসাথে
আমাদের অভিযোজন,
তাই বলা যাইস্বাভাবিক-ই কিছু কিছুএই
পরিবর্তন।

স্বপ্নের কাঞ্চন

SAYANI SAMADDAR 6TH SEMESTER

বুঝলে কাঞ্চন ! এসব পাহাড় ভালবাসাবাসি অনেক দেখেছি। কিন্তু, তোমারে যে ভালোবেসে আমি দেখিয়াছি, এইটা আগে কখনও দেখবার সৌভাগ্য টি হয় নাই। তোমারে ভালোবেসে চাহিতে গেলেই ভাসমান মেঘের প্রাচীর যেন আমায় ভালবাসতে দেই না। যেন! আমায় হিংসা করে দূরে ঠেলে দেয়, আমিও মনে মনে মেঘের সাথে হিংসা করে বলি কুচুটে মেঘ কোথাকার যেন! আমি তখনও মেঘের সাথে কলহ না বাড়িয়ে , একান্তে শুধু পাহাড় ভালবেসে যাই।

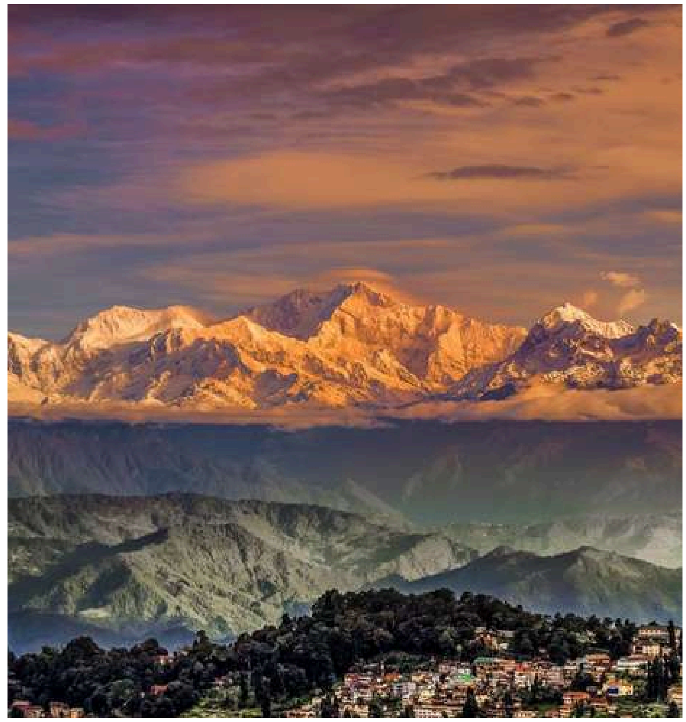

এক মস্ত বড় খোলা আকাশের নিচে বসে বসে পাহাড় কে বলি যে, শোনো গো আমার স্বপ্নের পাহাড় তোমায় দেখিবার ছলে যদিও কখনও আমার পিপাসিত দু - চক্ষু ভারী হইয়া আসে, কিন্তু! মন যে আমার তখনও এক ফুরফুরে হাওয়ার মতো তোমার ওই চারিদিকে ছুটে ছুটে বেড়ায়। আলো মেঘের সাথে তোমার খুনসুটি খেলা যেন আমায় উন্মাদ করে তোলে, ঠিক যেন নীল দিগন্তের মতো।

এই উন্মাদ হওয়াটা আজ থেকে নয়, যখন খুব ছোট ছিলাম তখন মায়ের কাছে গল্প শুনতাম, পাহাড়ের বাড়িগুলোতে নাকি মেঘ এক জানলা থেকে ঢুকে অন্য জানলা দিয়ে বের হয়। আর ঘরের ভিতরের সব কিছু নাকি ভিজিয়ে দিয়ে যায়। তারপর ক্লাস ফোরের বাংলা বই তে যখন তেনজিং নোরগে শেরপা আর স্যার এডমন্ড পার্সিভাল হিলারির এভারেস্ট জয়ের গল্পটা পড়ি, তখন থেকে মনে উদ্দীপনা জাগে কবে যে পাহাড়ে যাব, শুধু সেই ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকতাম।

তারপর একদিন সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' মুভি দেখার পর ইচ্ছেটা প্রবল থেকে প্রবলতর হলো। কিন্তু তখনও পাহাড় যাওয়া হয় নাই। তবে বাড়িতে সকল-সন্ধ্যা দুই বার সময় করে পাহাড়ের চা ঠিকই চলছিল।

মাধ্যমিক এর গন্ডি পেরিয়ে ঠিক যখন উচ্চ মাধ্যমিক এর দোর গোড়ায় এসে পড়লাম, তখন স্যার এর মুখে গল্প শুনলাম সোনার পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘার । তাই আবারও মন কেমন করতে লাগলো সোনার পাহাড় দেখার জন্য।

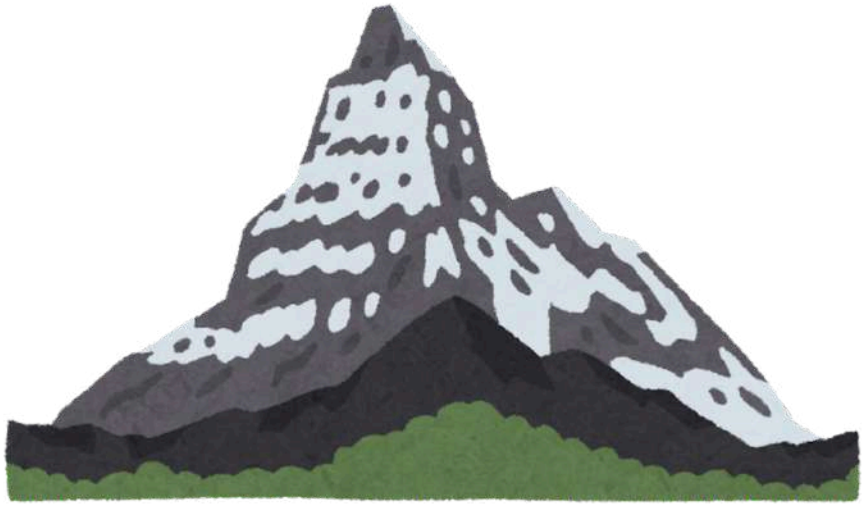

যাই হোক ! অবশেষে কলেজ জীবনে এসে আমার পাহাড় যাওয়ার দিনক্ষন ঠিক হলো। মনে মনে ঠিক যেমন উল্লাস হচ্ছিল, ঠিক তেমনই ক্ষণে ক্ষণে ভয় এর বাসা বাঁধতে শুরু হচ্ছিল, যে কেমন হবে আমার স্বপ্নের শ্বেতশৈল। কিন্তু পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে পৌঁছেই ভয় যেন নিমেষেই উধাও হয়ে গেল, যেন সারি সারি শুভ্র সাদা মেঘবালিকাদের দল খুশির আহ্বান দিয়ে গেল, সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা !

শুনেছি রবিঠাকুর নাকি তাঁর জীবদ্দশায় চারবার গিয়েও দেখতে পাননি এই অধরা সোনার পাহাড়। তবে আমি কিন্তু প্রথম বারেই দেখা পেয়ে গেলাম আমার স্বপ্নের সোনার পাহাড়ের। হঠাৎ মনে হতে লাগলো যেন স্বপ্ন কিছুটা হলেও স্বচক্ষে সার্থক হতে দেখছি,সে এক আলাদা অনুভুতি !

যথারীতি আমাদের স্বপ্নের পাহাড় ভ্রমণ ও সম্পন্ন হলো, আর যে যার বাড়ি ঠিক সময় অনুযায়ী পৌঁছে গেলাম.........। কিন্তু, হঠাৎ একটা গুপ্ত কষ্ট যেন মনে বাসা বুনতে শুরু করেছিল, মনে হচ্ছিল এত হাসি খুশির তিনটি বছর কাটিয়ে আমরা যেনো আজ শেষ পর্যায়ের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, আর মাত্র একটা স্টেশন বাকি আমাদের, স্টেশন এর নাম হলো 6th semester তারপর শেষ আমাদের এই যাত্রাপথ। এই ক্ষনিকের যাত্রাপথে এক গুচ্ছ গল্প আড্ডার স্মৃতি নিয়ে আমার হৃদয়ের স্টেশনে তোরা সকলেই আজীবন আমার স্বপ্নের শাশ্বত শ্বেতশৈলের মত রয়ে যাস প্রিয় বন্ধুরা।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও ভূগোল

SRITAMA BISWAS , 6TH SEMESTER

সংস্কৃতিসঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।সংস্কৃতি সর্বদা বিভিন্ন অঞ্চল কে বিভিন্ন অঞ্চলেরসাথে এক সূত্রে বেঁধেরাখে। তাই সংস্কৃত ওভূগোল একে অপরের সাথে অতপ্রতভাবেজড়িয়ে রয়েছে। কোন অঞ্চলের ভৌগোলিকবৈশিষ্ট্য যেভাবে সমৃদ্ধ করে ঠিক অনুরূপভাবেসংস্কৃতি ও অঞ্চলকে, জীবনযাত্রাকেউন্নত করে থাকে। আমাদেরনিজের বাড়ির সাথে প্রতিবেশীদের কিংবাদুটি পাড়ার, বা দুটি গ্রামেরঅথবা দুটি শহরের মধ্যেভিন্ন সংস্কৃতিকে আপন করে বসবাসকরার যে প্রবণতা তাআমাদেরকে একে অপরের সাথেজুড়ে রাখে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বৃহৎ। ভিন্নজাত, ভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে এই রাজ্যেকিন্তু তাদের সংস্কৃতি একে অপরের থেকেআলাদা অথচ তারা একেঅপরের সাথে বন্ধন বন্ধুত্বপূর্ণমনোভাব নিয়ে মেলামেশা করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গেরএত বৈচিত্র্য এর মধ্যেকোথায় কোন ধরনের সংস্কৃতিদেখা যায় তা এবারজেনে নেয়া যাক-

প্রথমেআসা যাক উত্তরবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গেরউত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এই অঞ্চল গুলিকে।

এই অঞ্চল গুলি প্রধানত পাহাড়ি অঞ্চল, পাহাড়ের উপত্যকায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম। এখানকার মানুষ তুলনায় অনেক সরল প্রকৃতির। এরা প্রধানত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে নিজেদের জীবিকা গড়ে তুলেছে । পর্যটন, বন সংরক্ষণের মতো বিষয়ের সাথে এই অঞ্চলের প্রায় ৭৫% মানুষ যুক্ত। এদের পোশাক পরিচ্ছদ হয় রঙিন। এদের খাদ্য হলো প্রধানত মোমো, ভাত, মাংস, পাহাড়ি সবজি যেমন-স্কোয়াশ, এছাড়াও চা, কফি। তবে এখানকার অধিকাংশ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হয়।এখানকার মানুষ অধিকাংশই হিন্দি, নেপালি বা স্থানীয় ভাষায় কথা বলে থাকে।

এখানকার অধিকাংশই বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মানুষ, এদের প্রধান উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা, সংসারী পূজা, গুরু পূর্ণিমা, ভাইটিকা প্রভৃতি। এক কথায় বলা হলে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ভূগোল পরস্পরের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে একটিকে ছাড়া অপরটি হল ও অকল্পনীয় ।

এবার আসা যাক দক্ষিণবঙ্গে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলটি প্রধানত উপকূলীয় বনভূমি অঞ্চল। সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী মানুষগুলি প্রধানত গ্রাম্য ও আদিবাসী প্রকৃতির বনের ধারে বা ছোট ছোট খরির ধারে গড়ে উঠেছে গ্রামগুলি । এরা প্রধানত জঙ্গলকে কেন্দ্র করে জীবিকা গড়ে তুলেছে। মধু সংগ্রহ, মৎস্য শিকার, প্রভৃতি ধরনের জীবিকার সাথে প্রায় ৫২ - ৬২% মানুষ যুক্ত থাকে। এছাড়াও পর্যটন ও এখানে অর্থনীতিকে ধরে রেখেছে, এদের পোশাক পরিচ্ছদে বাহুল্য কম, দরিদ্র মানুষের সংখ্যায় বেশি, তাদের ভাষা হল বাংলা। এদের খাদ্য হলো ভাত, গুগলি, গেঁড়ি, মাছ, বিভিন্ন সবজি প্রভৃতি। এখানকার উৎসব গুলি হল বনবিবির পূজা, কালীপুজো, দীপাবলি প্রভৃতি। এখানেও যেন প্রকৃতি মানুষকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে যে তাদের একটি অপরটির পরিপূরক।

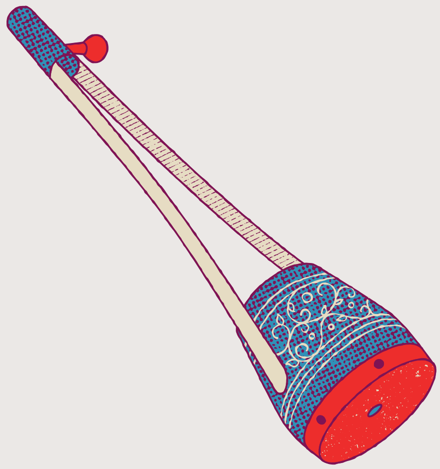

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশটি হল প্রধানত গ্রাম্য অঞ্চল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অংশ। দীর্ঘ অংশে দেখা যায় শাল, শিমুল, মহুয়ার বনভূমি। প্রকৃতিগতভাবে এই অঞ্চলটি রুক্ষ। অঞ্চল গুলিতে মানুষ তাই চাষবাস ও বন সংরক্ষণ করে জীবিকার নির্বাহ করে থাকে মানুষগুলি সরল ও গ্রাম্য প্রকৃতির । পোশাকের দিক থেকে খুব বেশি বাহুল্য দেখা যায় না। মেয়েদের শাড়ি ও ছেলেদের ধুতি হলো প্রধান পোশাক। এখানকার বাড়িঘর অত্যন্ত রঙিন, মেয়েরা নিজেদের হাতে দেয়াল চিত্র তৈরি করে, বাউল গান, পুরনো লোকসঙ্গীতের পিঠস্থান এই অঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে আদিবাসী নাচ, এখানকার মানুষের ভাষা হল স্থানীয় বাংলা ভাষা। এখানে অনেক স্থানীয় উৎসব দেখা যায় যেমন-নবান্ন, লবণ উৎসব, ছৌ নৃত্য বাউল উৎসব প্রভৃতি। এক কথায় বলতে গেলে কলা বিদ্যার সাথে অনৈতিক ভূগোল ও সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন তা এখানে অতি স্পষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব অংশটি প্রধানত গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাগুলিকে নিয়ে। অঞ্চল গুলি প্রধানত শহুর। এখানকার অধিকাংশ মানুষই চাকুরি, ব্যবসা অথবা কৃষি কাজের সাথে জড়িত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্র গুলি এখানে গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত আধুনিক। এখানে সমস্ত ধরনের মানুষ একসাথে বসবাস করে। প্রধান খাদ্য মাছ, ভাত, ডাল, তরকারি হলেও এখানকার মানুষ পাশ্চাত্য খাবার কেউ অত্যন্ত আপন করে নিয়েছে। এখানকার মানুষের পোশাক পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি। এখানকার প্রধান উৎসব গুলি হল দুর্গাপূজা, নববর্ষ, বড়দিন, কালীপুজো, ঈদ, মহরম প্রভৃতি। এই অঞ্চলে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও অঞ্চলটি আসলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রমাণ দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ কর্মসূত্রে এখানে ব্যবসা করায় অঞ্চলটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে অর্থনৈতিক ভূগোল ও সংস্কৃতি যেন মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্বের সেতু ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সংস্কৃতি মানুষকে ও তার জীবন যাত্রাকে যে কতটা প্রভাবিত করে তা বলে বা বিশ্লেষণ করে বোঝানো সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের সাথে তা নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ভূগোল, মানুষ, সংস্কৃতি একই সুতোয় গাথা। সংস্কৃতি ছাড়া ভূগোল ও ভূগোল ছাড়া সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ।

রবির গানে বঙ্গের ঋতুরঙ্গ

PROMITA ROY_6TH SEM

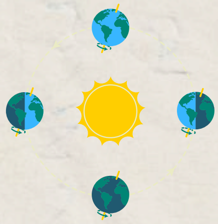

প্রকৃতিরলীলাভূমি এই বাংলায় একেরপর এক ঋতুর আগমনবাঙালির জীবনে এনে দেয় নবনব রূপ ও রসেরঅপরূপ ছন্দ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীতও বসন্ত - বছরে এ ছয়ঋতুর আবির্ভাব বিশ্বের খুব কম দেশেইদেখা যায়। কিন্তু সভ্যতারউন্নয়নের করাল গ্রাসে পরিবেশদূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়নের কুপ্রভাবে দিনদিনই এই ঐতিহ্য ওগর্বের আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। কৃষিপ্রধানএই দেশে আবহাওয়া বদলেরফলে দেখা দিচ্ছে নানাসমস্যা। পরিণাম স্বরূপ বর্তমানে বাংলায় মূলত গ্রীষ্ম, বর্ষাও শীত - এই তিন ঋতুরআধিপত্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে ।

গ্রীষ্মকালেরআগমন খ্রিস্টীয় সনের মধ্য এপ্রিলথেকে মধ্য জুন বাবাংলায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেহওয়ার কথা হলেও গরমেরআগমন ঘটছে বেশ আগেই।এখন মার্চ মাস থেকেই গরমপড়তে শুরু করে এবংশীত আসার পূর্ব পর্যন্ততা স্থায়ী হয়। এখন সমগ্রবর্ষাকালজুড়ে গ্রীষ্ম তার উপস্থিতির জানানদেয়। মধ্য জুন থেকেমধ্য আগস্ট আর বাংলা সনেরআষাঢ় ও শ্রাবণ এদুই মাস বর্ষাকাল হলেওদেশের গ্রামে-গঞ্জে বর্ষার বৃষ্টিধারার প্রাবল্য লক্ষিত হয় শ্রাবণের শেষকিংবা ভাদ্র মাসের দিকে।

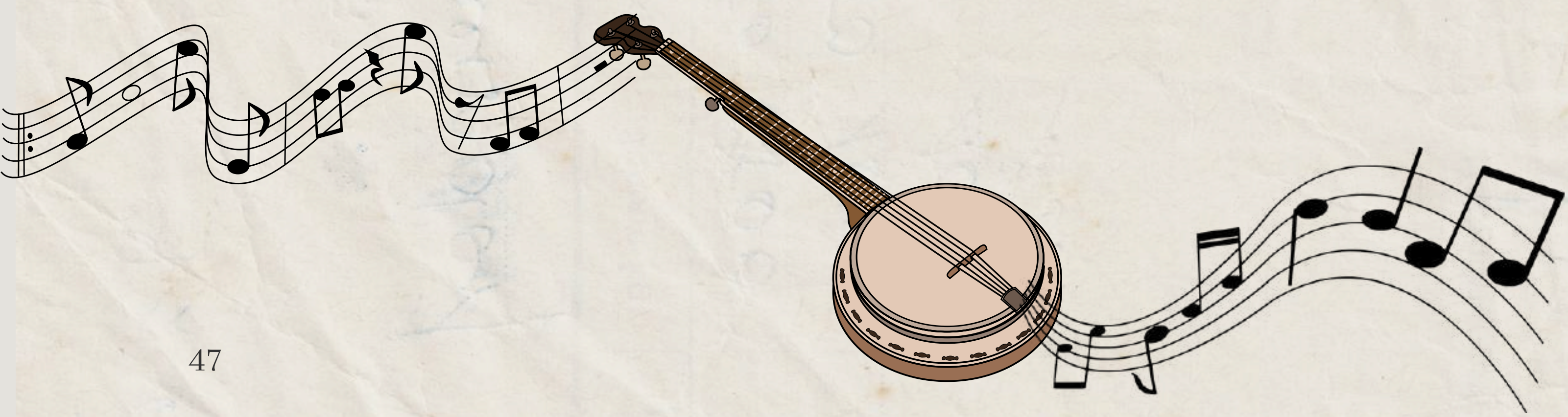

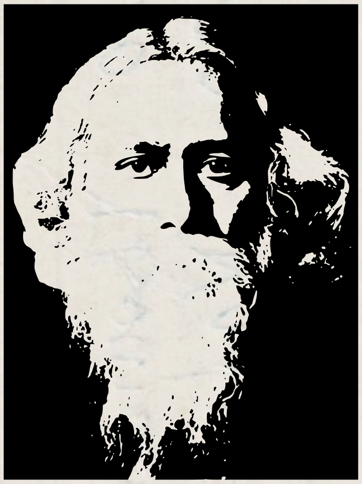

অন্যদিকে মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি বা বাংলা সনের পৌষ ও মাঘ মাসে শীতের আগমন ঘটার কথা থাকলেও সারা দেশে এখন একই সময়ে শীত পড়ছে না। দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা লক্ষ্য করা গেলেও অন্যান্য অঞ্চলে শীতের আগমন ঘটে দেরিতে। সময় পরিবর্তন হয়ে এখন কেবল জানুয়ারি মাসে শীতের আগমন ঘটে।

রবিকালের ঋতু ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রতিটি ঋতু যেন তাদের নিজ নিজ চিত্র, ধ্বনি, বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এ গানগুলো যেন বাংলার প্রকৃতির চিরকালের মর্মবাণী।
নিম্নে রবীন্দ্রনাথের গানে ঋতু বৈচিত্র্য খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল -

গ্রীষ্মকাল:
বৈশাখের রুদ্রতা ও কোমলতা দিয়ে কবি কামনা করেছেন সমস্ত গ্লানি দূর করে পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠা এক পৃথিবীর। গ্রীষ্মের গানে দারুণ দহনবেলার রসহীনতার চিত্র যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি বৈশাখী ঝড় যেন জীর্ণতার অবসানে নতুনের আগমনের পূর্ব সংকেত হয়ে ধরা দিয়েছে । রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখী ঝড় কেবল বাইরের প্রকৃতিতেই আসে না, হৃদয়ের ভেতরেও সে ঝড় তোলে। তিনি যেমন দেখেছেন গ্রীষ্মের কঠোর রূপ, বৈরাগীর বেশ ; অন্যদিকে তার রস-কোমলতা ও সৃষ্টির স্নিগ্ধতায়ও মুগ্ধ হয়েছেন কবি।
'গীতবিতান'-এ ১৬টি গ্রীষ্মের গান রয়েছে , যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৬০ থেকে ৭২ বছর বয়সের মধ্যে রচনা করেছেন।
যেমন -

১. চোখে আমার তৃষ্ণা
২. দারুণ অগ্নিবাণে রে
৩.এসো হে বৈশাখ
৪.ওই বুঝি কালবৈশাখী

বর্ষাকাল :

রবীন্দ্রসংগীতে এই বর্ষা ঋতুটা ধরা দিয়েছে এক স্নিগ্ধ শ্যামল সুন্দর রূপে। রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষার গানের বহু বিচিত্র সৌন্দর্য রয়েছে । ঋতুভাগের ভিত্তিতে গীত বিতানে ১১৫টি বর্ষার গান রয়েছে। 'গীতবিতান'-এর বর্ষার গানগুলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক রচনা করে দেয়। বর্ষাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কাব্যগাথা দ্বিতীয়টি আর নেই। বর্ষার গানে কবি বর্ষাকে 'শ্যামল সুন্দর' ব'লে আহ্বান করেছেন তাপ - শুষ্ক পৃথিবীকে সুধারসে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য। কবির লেখা কিছু বর্ষার গান হল -

১.শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা
২.এসো শ্যামলোসুন্দরো
৩.আজি ঝরো ঝরো
৪. গহন ঘন ছাইলো

শরৎকাল :

বর্ষার বিদায়ের সাথে সাথে ভাদ্রের সূচনায় কোমল সৌন্দর্য ছড়িয়ে শরৎরানী আসে সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে। নির্মল আকাশে সাদা মেঘের সাথে মিতালী হয় কাশফুলের। বাতাসের মৃদুমন্দ দোলায় কাশবন যখন পরম আনন্দে দুলতে থাকে তখনই বাঙালির মন উদার হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এমন স্নিগ্ধ কোমল রূপে কবিগুরুর হৃদয় উল্লসিত ও বিমোহিত হয়ে ওঠে। কবিগুরু বলেছেন "শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড় নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি। নীলটি তাজা।" (শরৎ-বিচিত্র প্রবন্ধ)
এই শরৎ উপপর্যায় সম্পর্কিত রবির ত্রিশটি গান রয়েছে। এই শ্রেণীটি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন। গানের ক্রম কবি নিজেই সাজিয়েছেন এবং সেই ক্রমানুযায়ী গানগুলি 'গীতবিতান' গ্রন্থে এসেছে। কবির লেখা কিছু শরতের গান হলো -

১.আজ ধানের খেতে রৌদ্র
২.শরৎ তোমার অরুণ আলোর
৩.মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
৪.আমার রাত পোহাল

হেমন্তকাল :

রবীন্দ্রনাথের লেখায় সব ঋতু ঠাঁই পেয়েছে কমবেশি, তবে সবচেয়ে কম লিখেছেন হেমন্ত নিয়ে। হেমন্ত কে কবি "লক্ষ্মী" উপাধি দিয়েছিলেন। হেমন্তের ফসলভরা খেতে দেশমাতৃকার হাসি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির লেখা কিছু হেমন্তের গান হল -

১. হায় হেমন্তলক্ষ্মী
২. হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী
৩. সে দিন আমায় বলেছিলে

শীতকাল :

হেমন্তের পরেই শীত। শীতের আগমনে হিমেল হাওয়া ও কুয়াশায় কবি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। গাছের পাতাঝরার মধ্যে কবি শূন্যতা, কাঙাল হওয়া, জীর্ণতা, দীর্ণতা ও দুঃখময়তা অনুভব করেছেন। একদিকে ফসল কাটার কাল, অন্যদিকে গাছে গাছে ঝরাপাতার উৎসব। ধানের শীষে শিশিরবিন্দু দেখে কবির মন সৌন্দর্যে ডুবে গেছে। কবির লেখা কিছু শীতের গান হল -

১. পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
২. শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন
৩. এল যে শীতের বেলা
৪. শিউলি-ফোটা ফুরোল

বসন্তকাল:

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষা হলেও বসন্তের আগমনধ্বনি পাওয়া যায় তার অজস্র গানে, কবিতায়। বসন্তের কবিতা বা গানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি। বসন্ত উপ-পর্যায় সম্পর্কিত ৯৬ টি গান রয়েছে। গানের ক্রম যেমন ভাবে কবি সাজিয়েছেন , সেই ক্রমেই 'গীতবিতান' গ্রন্থে গানগুলি রয়েছে। কবির লেখা কিছু বসন্তের গান হল -

১. আজি দখিন - দুয়ার খোলা
২. ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
৩. ওরে গৃহবাসী
৪. আজ খেলা ভাঙার খেলা

গ্রাম-বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য নিয়ে কিছুই আমাদের অজানা নয়। তবুও কবিগুরুর গান ও লেখা ঋতুরঙ্গকে নতুনভাবে জানতে ও চিনতে শেখায়। কবিগুরুর অন্যান্য গানগুলি সহ প্রকৃতি-পর্যায়ের গানগুলি সারা জীবন পৃথিবীর বুকে অমূল্য রত্ন হিসেবে থেকে যাবে।

সূত্র - 1.https://www.jugantor.com/
2.https://www.jagonews24.com/
3.https://samakal.com/
4.https://shaili.tv/
5.https://www.dainikbangla.com.bd/
6.https://bangla.thedailystar.net/

বেস্টফ্রেন্ড

Annesha Bhakat, 4th semester

কী রে সমরেশ কাকিমা কেমন আছেন এখন?প্রশ্ন করল অসিত। উত্তরে সমরেশ বলল,"মায়ের শ্বাসকষ্টটা বেড়েছে আগের থেকে ,বিষয়টা একদম ভালো ঠেকছে না আমার" ডাক্তার বলেছেন প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন,কিন্তু....চুপ করে গেল সমরেশ।

অসিত বলে ওঠে কি রে চুপ করে গেলি কেন? কিন্তু কি? এখন তো অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকার কোনো খবর পেলি ওটার?

নাহ রে অনেক চেষ্টা করলাম কোনো খবরই পাইনি,সবাইকেই বলে রেখেছি পেলে আমাকে জানাতে, আর না পেলে শেষটায় ওই ব্ল্যাকেই....

সমরেশের এই কথা গুলো দরজার কোণে দাঁড়িয়ে শুনছিল তারই ছোট্ট মেয়ে তিয়াসা। একনিমেষে ছুটে গেলো ব্যালকনিতে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলো টবসহ একটা ফুল গাছের চারা। তারপর সমরেশের হাতে দিয়ে বলল,বাবা এটা আমার 'best friend' ওর সাথে আমি রোজ খেলা করি,কথা বলি,ওকে তুমি ঠাম্মির পাশে রেখে দাও,এখন থেকে ঠাম্মির পাশে ওই থাকবে। আমি বইয়ে পড়েছি "গাছেরা অক্সিজেন দেয়" দেখবে ঠাম্মির আর কোনো কষ্ট হবে না। চোখের কোনটা চিক চিক করে উঠলো সমরেশের জড়িয়ে ধরলো মেয়েকে আর মনে মনে ভাবলো, "এতটুকু একটা মেয়ের চিন্তাভাবনা কি অসাধারণ" ।

ছকভাঙা স্বপ্নরা

MOUMITA NATH, 4TH SEMESTER

"শুনলাম নাকি ভক্তর মেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে জেলায় প্রথম হয়েছে।" প্রহ্লাদ বাবু জগুর বানানো চায়ে চুমুক দিয়ে বলে ওঠেন।
"হ্যাঁ গো দাদাবাবু। আগের দিন আমি ভক্ত দাদাবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিলাম যখন, তখন তিনি আমাকে নিজেই বলেছেন।" জগু উত্তর দেয়।
শেখরবাবু বলেন, "বাহ্! ভালোতো। আমাদের পাড়ার মেয়ে জেলায় ফার্স্ট হয়েছে তা তো আনন্দের ব্যাপার আর ভক্ত তো কম পরিশ্রম করেনি মেয়ের পেছনে..."
"কি ব্যাপার? আমাকে নিয়ে কী চর্চা হচ্ছে?" চায়ের ছোট দোকানটায় ঢুকে প্রশ্ন করেন ভক্তবাবু।
"এসো ভক্ত, বোসো। তোমার মেয়ে যে এত ভালো রেজাল্ট করেছে, আমাদের পাড়ার নাম উজ্জ্বল করেছে তাই নিয়েই কথা হচ্ছে।" শেখর বাবু বলেন, "জগু ভক্তকে চা দে।"
চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভক্তবাবু বেঞ্চে বসেন। প্রহ্লাদ বাবু শুধোন, "হারে ভক্ত, তোর মেয়ের উচ্চমাধ্যমিক তো হল। তা এবার মেয়ের বিয়ে দিবি নাকি?"

কথাটা শুনে ভক্ত বাবু শান্তভাবেই বলেন, "কেন দাদাবাবু? বিয়ে দেব কেন? আমার মেয়ে তো বড় ডাক্তার হবে। ওকে ডাক্তারি পড়াবো।"
যেন এর থেকে বেশি হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। হাসির ফোয়ারায় ভেসে যায় চায়ের দোকান। কোনভাবে হাসি সামলে প্রহ্লাদবাবু বলেন, "ওহ্ ! হাসালি বটে ভক্ত। তুই লোকের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে পড়াস। কতটুকু রোজগার হয় তোর? তুই কিনা মেয়েকে ডাক্তার বানাবি। ডাক্তারি পড়াতে কত টাকা লাগে জানিস? কোথা থেকে জোগাড় করবি অত টাকা?"
"দাদাবাবু বামন হয়ে চাঁদ ছুঁতে শেখাচ্ছো নাকি মেয়েকে?" জুগুর ব্যঙ্গোক্তি কানে আসে।
প্রহ্লাদবাবু বলেন, "শোন ভক্ত তোকে আমরা ভালোবাসি। তাই বলছি মেয়ের পাগলামোতে নাচিস না।"
"ওগুলো কে পাগলামো বলবেন না দাদাবাবু। ওগুলো তো ওর স্বপ্ন। স্বপ্নকে এভাবে অপমান করবেন না।"
দশ বছর পর...

ওটির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অ্যাপ্রোন পরিহিতা স্বনামধন্য হার্ট সার্জেন মেঘালী চৌধুরী এবং তার সহকারি ডাক্তার প্রান্তর ব্যানার্জি ও বিদিপ্তা ব্যানার্জি।
পেশেন্টের পরিবার পরিজন তাদের ঘিরে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। মেঘালী পেশেন্টের স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন, "চিন্তা করবেন না জেঠিমা। প্রহ্লাদ জেঠু ঠিক আছেন। হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সাকসেসফুল।"
দুদিন পর...
শোভাগঞ্জের বড় রাস্তার উপর এসে থামে একটি ব্ল্যাক এসিইউভি। নেমে আসে মেঘালী আর তার বাবা ভক্ত বাবু।
মেঘালী বলে, "বাবা চিনতে পারছো জায়গাটা?"
স্মৃতিমেদুর গলায় ভক্ত বাবু বলেন, " চিনবো না! এখানে আমাদের বাড়ি ছিল। আমাদের স্বর্গ।" একটু থামেন ভক্তবাবু। তাকিয়ে থাকেন সামনের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে।
"হম্। চলো এবার।" বলেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায় মেঘালী।

ভক্তবাবু চমকে ওঠেন, "ও কি করছিস মেঘ? ওরকম ভাবে অচেনা লোকের বাড়িতে ঢুকতে নেই।"
মেঘালী থমকে দাঁড়ায়। তারপর পেছন ফিরে হেঁটে আসে বাবার কাছে। বাবার হাতটা ধরে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাবার চোখে চোখ রেখে ধরা গলায় বলে, "এটা অচেনা লোকের বাড়ি নয় বাবা।"
"মানে?"

মেঘালী তার বাবার হাতের তালুতে একটা চাবির গোছা রেখে সজল নয়নে বলে, "এটা আমাদের বাড়ি বাবা।"
ভক্তবাবু হতবাক হয়ে যান, "কিন্তু আমি তো..."
"হ্যাঁ তুমি বেঁচে দিয়েছিলে। বলেছিলে আমার স্বপ্নের জন্য তুমি নিজেকেও বিকিয়ে দিতে পারো। সবাই বলেছিল বামন হয়ে চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছি। তুমি বলেছিলে, "তুই তো আমার মেঘ। তুই তো চাঁদেরই স্বপ্ন দেখবি।" সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে একদিন তোমাকে তোমার স্বর্গ ঠিক ফিরিয়ে দেবো।"
আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েন ভক্তবাবু। তার একতলা ছোট বাড়িটা বিক্রির পর তিনি শুনেছিলেন বাড়ির নতুন মালিক বাড়িটা ভেঙে একটা দোকান বানিয়েছেন। শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গাতেই তার মেয়ে যে আবার তাকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়ে উপহার দেবে সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি ভক্তবাবু। মেয়েকে বুকে জাপটে ধরে ধরা গলায় বলেন, "অনেক বড় হও মা। আজ তোর মা তোকে খুব খুশি হবে জানিস তো, খুব আশীর্বাদ করবে। তোর মাই আমার ছোট্ট ভিটেটাকে বাড়ি বানিয়েছিল আর তারপর তুই সেই বাড়িটাকে স্বর্গ বানিয়েছিস। আমাদের এক টুকরো স্বর্গ।"
সময় যেন এক অনন্ত প্রবাহমান নদী। সে কারোর কথা শোনে না, কারোর বাঁধা মানে না। কখনো সে নির্দয়ভাবে পাড় ভাঙ্গে আবার কখনো যত্ন করে পাড় গড়ে। আর এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলতেই থাকে।
কলিংবেলের শব্দে ঘোর ভাঙ্গে ভক্তবাবুর। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখেন বিদিপ্তা দাঁড়িয়ে।
"বিদিপ্তা আয় ভেতরে আয়। এত দেরি হল কেন? আর প্রান্তরই বা কোথায়?"
"জ্যামে আটকে গেছিলাম কাকু, তাই দেরি হল। আর দাদাভাইয়ের লাস্ট মোমেন্টে একটা ইমার্জেন্সি কেস চলে আসে। তাই দাদাভাই আসতে পারল না।"

"ঠিক আছে। এখন আয় খেতে বস।"
রাতের আহার পর্ব সমাপন করার পর মেঘ বিদিপ্তাকে এগিয়ে দিতে যায় তার গাড়ির কাছে। বিদিপ্তা মেঘকে জড়িয়ে ধরে বলে, "আয়াম সো প্রাউড অফ ইউ মেঘ।"
"এই নিয়ে তুই ২৭ বার এই কথাটা বললি।"মেঘ জানায়।
শুনে হেসে ফেলে বিদিপ্তা। তারপর বলে, "তোকে কলেজ থেকে দেখছি। তিনটে পার্ট টাইম জব আর তার সাথে সাথে এই ডাক্তারির পড়াশোনা সামলে আজ তুই দেশের একজন বিখ্যাত হার্ট সার্জেন। জানি জীবণটা তোর খুব একটা সহজ ছিল না। বাট ইউ মেড ইট। আর এত খ্যাতির পরও তুই সেই মেঘই আছিস, আমাদের মেঘ। এরকমই থাকিস যেন।"
বিদিপ্তা গাড়িতে উঠে জানালাটা নামিয়ে একটা ব্যাগ বাড়িয়ে দেয় মেঘের দিকে।
মেঘ প্রশ্ন করে, "এটা আবার কি?"
বিদিপ্তা উত্তর দেয়, "তোর নতুন বাড়িতে প্রথম এলাম। খালি হাতে আসতে পারি? তাই আমার আর দাদাভাইয়ের তরফ থেকে একটা ছোট্ট উপহার।"
বিদিপ্তার গাড়ি দূরে মিলিয়ে গেলে মেঘ ঘরে ফেরে। ব্যাগটার মধ্যে কি রয়েছে সেই কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে অবশেষে ব্যাগের মধ্যে থেকে জিনিসটা বের করে। গিফ্ট র‍্যাপারটা খুলতেই আপনাআপনি মুখে হাসি ফোটে মেঘের।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো'।
বইয়ের প্রথম পাতাটা উল্টোতেই নীল কালিতে একটা লেখা চোখে পড়ে মেঘের -
বেঁচে থাক সেই জেদি মেয়েগুলো
ডানা মেলুক তাদের স্বপ্নগুলো।

CONTRIBUTION OF 10 NOTABLE GEOGRAPHERS IN THE FIELD OFGEOGRAPHY

PRITHA TALUKDER , 6TH SEMESTER

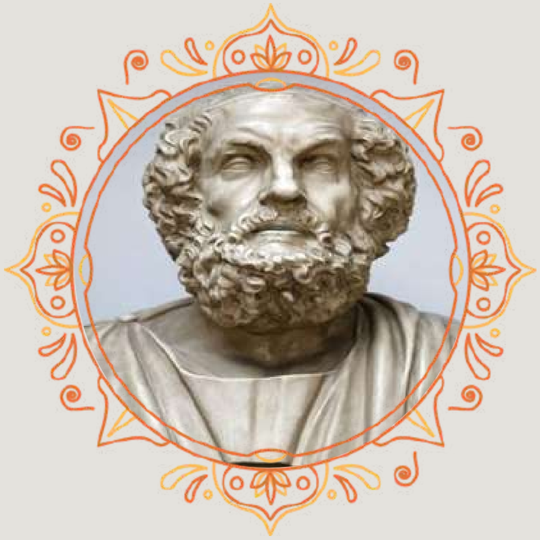

INTRODUCTION:

Geography, the study of the diverse environment places and spaces of Earth's surface and their interactions. It seeks to answer the question of why things are as they are, where they are. The modern academic discipline of geography is rooted in ancient practice, concerned with the characteristics of places, in particular their natural environments and peoples. However, it's separate identify was first formulated and named some 2,000 years ago by the Greeks, whose "Geo" and "graphein " were combined to mean " earth writing" or " earth description”. However, here the contribution of 10 notable geographers/ scholars in the field of geography is discussed below.

HOMER

In the ancient Greek scholarship, two traditions of geographical studies are found, namely, the mathematical tradition and the literary tradition.

It is a common belief that Homer is regarded as the Father of Geography. This is because he introduced the literary tradition through his monumental work

“Odyssey” and “Iliad”.

TIME PERIOD: 850BC.

CONTRIBUTION:

∆ He described the four winds coming from different directions and named them Boreas (North), Eurus (East), Notus (South) and Zephyrus (West).

∆ He introduced the literary tradition through his monumental work ' Odyssey and Iliad '.

THALES OF MILETUS

Thales was the first Greek genius, philosopher, and traveller who was concerned with the basic theorems of geometry.

TIME PERIOD: 620 BC - 546 BC

CONTRIBUTION:

He proposed the following six geometric propositions –

ΔThe circle is divided into two equal parts by its diameter.

ΔThe angles at either end of the base of an isosceles triangle are equal.

Δ When two parallel lines are crossed diagonally by a straight line, the opposite angles are equal.

Δ The angle in a semi-circle is a right angle.

Δ The sides of similar triangles are proportional.

Δ Two triangles are congruent if they have two sides and one angle respectively equal (James and Martin, 1972).

ARISTOTLE

Born in 384 BC in Stagira, a small town on the northern coast of Greece,

Aristotle is arguably one of the most well-known figures in the history of ancient Greece.

He was a popular pupil of famous ancient Greek philosopher Plato.

TIME PERIOD: 384BC-323BC

CONTRIBUTION:

ΔSyllogism is a certain form of reasoning where a conclusion is made based on two premises. These premises always have a common or middle term to associate them, but this binding term is absent in the conclusion. This process of logical deduction was invented by Aristotle, and perhaps lies at the heart of all his famous achievements.

ΔFor his time and age, Aristotle was able to put forth a very detailed analysis of the world around him. At present, the term "meteorology" specifically encompasses the interdisciplinary scientific study of atmosphere and weather. But Aristotle had a far more generalized approach wherein he also covered the
different aspects and phenomena of air, water, and earth within his treatise Meteorological.

ΔHis analysis of these different meteorological occurrences is one of the earliest representations of such phenomena, although that doesn't
say much about the accuracy of his meteorological studies. Aristotle believed in the existence of "underground winds" and that the winds and earthquakes were caused by them.

ARYABHATTA

The introduction of Aryabhata to the world happened through his remarkable work in the field of mathematics and astronomy. Aryabhata is one of the most renowned Indian Mathematicians, in fact, one of the firsts. Born in the Gupta era that is during the rule of the Gupta Dynasty in 475 CE.

TIME PERIOD: 476 CE- 550CE

CONTRIBUTION:

Δ Aryabhata suggested that the earth rotates on its axis daily. And the relative movement of the stars is caused by the motion of the earth. In this first chapter of his book Aryabhatiyam, he mentions the number of earth rotations in a yuga.

∆ Aryabhata explained lunar and solar eclipses with scientific experiments. He stated that the planets and the Moon shine due to the reflected sunlight. He explained the eclipses in terms of shadows falling on the Earth.

∆Considering the modern units of time, Aryabhata calculated the sidereal rotation (the rotation of the Earth concerning the stars) as 23 hours, 56 minutes and 4.1 seconds. The modern value of time was written as 23:56:4.091.

∆Aryabhata gave an astronomical model which stated that the Earth rotates on its axis. His model also gave corrections for the calculations of mean speeds of the planets concerning the Sun. His calculations were based on the heliocentric model in which the planets and the Earth revolve around the Sun at the centre of the universe.

BRAHMAGUPTA

According to the statements in some received sources, Brahmagupta was born in 597 CE. He resided in Bhillamala, presently Bhinmal, in Rajasthan, during the Chavda dynasty ruler, Vyagrahamukha

TIME PERIOD: 597 CE- 668 CE

CONTRIBUTION:

∆Brahmagupta said that because the Moon is closer to the Ground than the sun, the degree of the lit section of the Moon is determined by the Sun's and Moon's relative positions, which can be calculated using the size of the separation between the two objects.

∆Brahmagupta mentioned 'gravity'. 'Bodies fall toward the earth because it is in the fact that the earth too attracts bodies, just as it is in the nature of water to flow.

∆ He said the Earth is a sphere whose circumference is approximately 36,000 km, which means 22,500 miles.

AL- MASUDI

Al-Masudi, the legendary geographer and historian known as the "Herodotus of the Arabs," is considered the most celebrated scholar among the early Arab voyagers to India. He was the first Arab writer to write works that united history with scientific geography.

TIME PERIOD: 896 AD- 956 AD

CONTRIBUTION:

∆ Al-Masudi referred to the Atlantic Ocean as the Dark-Green Sea, and he believed that the Atlantic and Indian Oceans were connected.

∆ After retracing his journey around the Indian Ocean's rim, Al Masudi continued south to Madagascar.

∆Al Masudi travelled to the Indian Ocean, the Red Sea, the Mediterranean, and the Caspian Sea.

∆According to him, Turks who immigrated to India lost their cultural identities and gained new ones that were better adapted to their new environment.

IBN BATTUTA

On February 25, 1304 in Tangier, modern-day Morocco, Ibn Battuta was born. This Atlantic Ocean port city is 45 miles west of the Mediterranean Sea, close to the western side of the Gibraltar Strait, where Africa and Europe almost collide.

TIME PERIOD: 1304 AD - 1377 AD.

CONTRIBUTION:

∆ Ibn Battuta's most significant contribution lies in his detailed accounts of the lands he visited, offering invaluable information about the geography, people, customs, and political landscapes of the medieval world. His writings provided later generations with a unique perspective on the interconnectedness of civilizations during that era.

BERNARD VARENIUS

Varenius was born near Hamberg, Germany. He was enriched with knowledge of Philosophy, mathematics and physics. With scientific foundation he acquired sowed the seeds of the scientific thought of geography.

TIME PERIOD: 1622 AD - 1650 AD.

CONTRIBUTION:

∆ "Geographic Generalis" authored by Varenius, represented a major leap forward in the field of geography.

∆ Varenius renewed the mathematical tradition in geography. In fact, he was so impressed with the mathematical works of Kepler, Galileo and Newton that he vehemently criticized those who reduced geography to a mere description of countries. He may be credited for pioneering several developments in the subject matter of geography.

∆ He was one of the first scholars to highlight on the differences in the nature and content of physical and human geography though he himself was not much interested in the latter. This was because human geography could not be subjected to mathematical laws.

∆Varenius was the first to describe the differences in the amount of insolation received at different latitudes on the earth and pointed out that the highest temperatures on the earth were recorded in the hot deserts of the tropical areas and not in the equatorial belt.

∆ He was also one of the first to explain the world's wind systems. Varenius stated that the air masses close to the equator were heated up and thinned out to be replaced by cold and heavy air masses from the polar regions.

IMMANUEL KANT

He was the most influential geographer in the pre - group German geographers. He explained the methods of studying geography from a philosophical point of view and established the distinction of geography from other scientific subjects.

TIME PERIOD: 1724 AD - 1794 AD.

CONTRIBUTION:

Δ According to Kant, knowledge can be acquired philosophically in two ways viz:

A) by perception and experience.

B) logical reasoning.

Δ His division of geography into several branches helped later scholars to define elaborately the multiple sub - branches of geography during the subsequent period.

Δ The impact of Kantian views on geography is profound. For the first time, geographical knowledge become systematised.

Δ According to Kant, the acquiring of knowledge can be divided into two parts like logical classification and physical classification.

Δ He also gave fivefold divisions of geography, these are ------

1) Mathematical (the form, size and movement of the earth and it's place in the solar system)

2) Moral (the customs and character of men in relation to the environment)

3) Political.

4) Mercantile (commercial)

5) Theological (the distribution of regions).

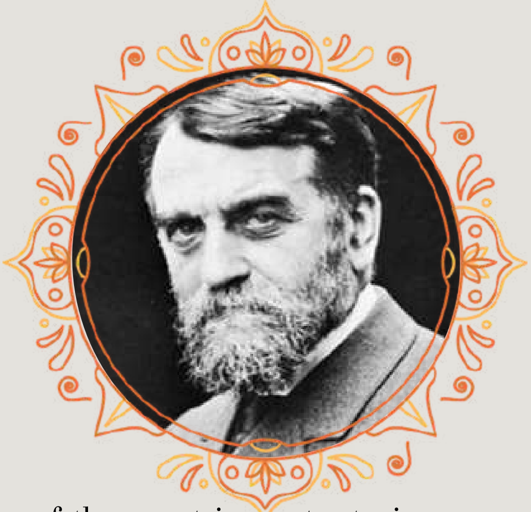

PAUL VIDAL DE LA BLACHE

Paul Vidal de la Blache was one of the most important pioneers of modern geography. It was he who created a place for human geography among the sciences of man and became the leader of the French school of geography. He was known as " FATHER OF HUMAN GEOGRAPHY”.

TIME PERIOD: 1845 - 1918.

CONTRIBUTION:

∆ In 1881, he founded a new professional periodical for the best geographical writings. The periodical was called " Annales de Geographie "

∆ In 1894, Paul Vidal de la Blache published the first edition of the " Atlas General Vidal - Lablache"

∆ GENRE- DE -VIE: according to blache , Genre de vie means a way of life or lifestyle -- which depends on people's education, culture, habits, manners, reformation etc . Different people in the same natural environment are bound to different lifestyle or ways of life by their cultural traditions.

∆ Most of Vidal's research is related to human geography. After his death in 1918, his devoted student Martonne compiled all his research work and published a book called “PRINCIPLES OF HUMAN GEOGRAPHY".

CONCLUSION:

For the most people geography is about physical features, formation of mountains, plateau, climatic changes, longitudes, latitudes, and about the earth's position in the solar system etc. But from the ancient time it is seen that many geographers/ scholars had tried to expand the scope of geography in many ways from including mathematics in the field of geography to include human and their interactions with the environment in geography, here in the above text a brief discussion about those contributions are discussed.

REFERENCE:

∆Dikshit R.D., 1997: Geographical Thought: A Contextual History of Ideas, Prentice - Hall India.

∆ https://www. britannica.com

∆ https://en.wikipedia.org

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় : রাষ্ট্রহীন এক জাতির উপাখ্যান

জয়শ্রী মন্ডল

সহকারি অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

রাষ্ট্র হল মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জাতীয়তার অধিকার রয়েছে। এই যুগে, যদি কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন হয়ে যায়, তবে সে এমনকি মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে। রোহিঙ্গা মায়ানমারের এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা বর্তমানে রাষ্ট্রহীন। বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিকত্বের কোনও ন্যায্য দাবি নেই ।

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, রোহিঙ্গারা। মায়ানমারে তাদের উৎপত্তি দাবি করা সত্ত্বেও, রোহিঙ্গারা খুব কমই নিরাপদ অনুভব করে এবং তারা ক্রমাগত নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার । রোহিঙ্গাদের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক সহিংসতার বিষয়টি নতুন নয়, বরং কয়েক দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু 1948 সালে বার্মার স্বাধীনতার পর রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। 1962 সালে সামরিক জুন্টা সরকার রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনামলে, রোহিঙ্গারা চলাচলে বিধিনিষেধ, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জোরপূর্বক শ্রম, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের বিদেশী হিসাবেও বিবেচনা করা হত। তাদের হতাশাজনক পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতিবেশী রাজ্যে চলে যাওয়া এবং তাদের নিজের রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। 1978 সালে নিপীড়ন ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তারপর থেকেই মায়ানমারের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ক্রমাগতভাবে রোহিঙ্গাদের অভিবাসন চলছে। মায়ানমার সরকারের ব্যাপক বঞ্চনা এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার জনগণের নিপীড়নের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। মায়ানমার নির্বিচারেভাবে রোহিঙ্গাদের জাতীয়তা কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের রাষ্ট্রহীন করে দিয়েছে এবং এটি তাদের সমস্ত মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। মায়ানমারের 1982 সালের নাগরিকত্ব আইন রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীনতার পিছনে কেন্দ্রীয় আইনি হাতিয়ার। আইনটি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যা বিশেষ করে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করেছিল।তাদের রাষ্ট্রহীন অবস্থা রাজ্যের বর্ণনাকে আরও জোরদার করেছে যে তারা বিদেশী বা সরকারী পরিভাষায় "অবৈধ অভিবাসী" যারা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অযোগ্য।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

মায়ানমারে মানবিক বিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মুসলমান জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গারা। ৪ম শতাব্দী থেকে তাদের উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তারা দাবি করে যে মায়ানমারে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনের আগেই তারা রাখাইন রাজ্যে বসবাস করে আসছে। কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গাদের পরিচয় এবং জাতিগততা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মায়ানমার সরকার তাদের নাগরিকত্বের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং বরং তাদের বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী হিসাবে উল্লেখ করে। 1982 সালে মায়ানমার আনুষ্ঠানিকভাবে মায়ানমারের 135টি জাতিগত গোষ্ঠীকে ঘোষণা করে যেখানে রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন করে তুলেছিল। 2012 সালে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান এবং রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং তারপর থেকে মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর ক্রমাগত নিপীড়ন চলছে। তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সহিংসতা এবং জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির সম্মুখীন হয় যা তাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাই রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিসাবেও পরিচিত।

তাদের নিজ দেশে রোহিঙ্গাদের প্রতি রাজনৈতিক সংকটের অস্তিত্ব তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় ও সুরক্ষার সন্ধানে বাংলাদেশ ও ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে চলে গেছে এবং অনেকে UNHCR-এর অধীনে বসতি স্থাপন ও নিবন্ধিত হয়েছে এবং ভারতে শরণার্থী হিসাবে বসতি স্থাপন করেছে।

জীবন ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম: ভারতবর্ষে রোহিঙ্গা জনজাতির অবস্থান:

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং দিল্লি সহ ভারত জুড়ে বস্তি ও শিবিরে প্রায় 40,000 রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে। UNHCR -এর অধীনে প্রায় 16,000 রোহিঙ্গা শরণার্থী নিবন্ধিত রয়েছে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে ভারত সরকারের অবস্থান কিছুটা জটিল। যদিও কিছু শরণার্থী ভারতে প্রবেশ ও বসবাস করতে সক্ষম হয়েছে, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। পরিবর্তে তাদের অবৈধ অভিবাসী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা তাদের বসতি স্থাপন এবং অধিকার ও পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকারের জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। তাদের আইনি মর্যাদার অভাবে ভারতে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদির মতো মৌলিক পরিষেবাগুলিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। তাদের দুর্বল পরিস্থিতি তাদের শোষণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপারে ভারত সরকারের অবস্থান সতর্ক। সরকার জাতীয় নিরাপত্তা এবং অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্ভাব্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার উদাহরণ রয়েছে এবং এর ফলে তাদের উপস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে।

ভারতে রোহিঙ্গারাঃ ভুক্তভোগী না অবৈধ অভিবাসী?

ভারতবর্ষে রোহিঙ্গাদেরকে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। প্রথমত তারা ‘victims” দ্বিতীয়তঃ তারা ‘অনুপ্রবেশকারী” ।এরকম ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ার কারণ হলো প্রথমত ভারতবর্ষের বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের প্রমাণ। অন্যদিকে রয়েছে শরণার্থী হিসেবে ন্যূনতম মানবিক অধিকার গুলি যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নূন্যতম মানবিক পরিসেবা ইত্যাদি থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ।

তাই রোহিঙ্গা সংকট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। শুধু একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রোহিঙ্গা সংকট।শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর প্রায় সব জনবহুল দেশেই শরণার্থীদের অধিকার সম্পর্কে আইনি ও অবৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত ও অন্যায়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে।

শরণার্থী সংকট এবং নিরাপত্তা সমসাময়িক বিশ্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের ক্ষেত্রে, এই দুটি বিষয়কে একটি ফ্রেমে আলাদা করা একটি বড় সমস্যা। দেশে তাদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ,মানবিক দিক থেকে রোহিঙ্গাদের অনিশ্চিত অবস্থা এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যালোচনা করা দরকার।

কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গা সংকটকে সম্মিলিতভাবে সমাধান করার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

• Chakraborty, M. (2015). Stateless and Suspect: Rohingyas in Myanmar, Bangladesh and India. In Rohingyas in India: Birth of a Stateless Community. Mahanirban Calcutta Research Group .

• Verma, M:Struggle for Life and Liberty: Rohingyas in India: (2019) Conflict, Justice, Decolonization: Critical Studies of Inter-Asian Society (2019)

• Dutta, P. K. (2017, September 8). Rohingyas in India and terror threat: How jihadi forces may have infiltrated persecuted Muslims of Myanmar. India Today.

• Mithun, M. B. (2018). Ethnic conflict and violence in Myanmar: The exodus of stateless Rohingya people. International Journal on Minority and Group Rights.

• Majumder, Suchismita(2015). Rohingyas languishing behind the Bar. Policies and practices.

• Mohajan, Haradhan Kumar(2018). History of Rakhine state and the origin of the Rohingya muslims. The Indonesian journal of southeast Asian Studies.

• Samaddar, Ranabir and Sabyasachi Basu Roy Choudhury (2018). The Rohingya in south Asia: people without a state. Routledge India.

• Das, B.: (July, 2023) STATELESSNESS AND FORCED MIGRATION: A STUDY OF ROHINGYA REFUGEES IN INDIA: International Journal of Creative Research Thoughts.

• Storai, Yousuf(2018). Systematic Ethnic Cleansing: The case study of Rohingya. Arts and social sciences journal. • Sundaram, Jayashri Ramesh(2019). Decoding India's stand on the Rohingya crisis. Centre for public policy research.

প্রকৃতির রুদ্ররোষে হড়পা বান

মহঃ ইসরাফিল ধাবক

সহকারি অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যাধিক বৃষ্টি বা হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদের জলে আচমকা বাঁধ ফেটে বন্যা হলে তাকে হড়পা বান বলে। প্রতিবছর হড়পা বানের কারণে প্রায় ৫০০০ জনের মৃত্যু ঘটে। হড়পা বান হল স্বল্প এলাকায় সংঘটিত দ্রুত বন্যা। হড়পা বানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বন্যা দেখা যায়। হড়পা বান আকস্মিকভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে।এই বন্যা ভারী বৃষ্টিপাতের কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা পরে ঘটতে পারে।

হড়পা বানের কারণ সমূহঃ

1. মেঘ বিস্ফোরণ বা মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি এর মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বৃষ্টিপাত হলে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়।
2. পার্বত্য অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে যে ভূমিধস ঘটে তার ফলেও হড়পা বান হতে পারে।
3. নদীবক্ষে ধসের ফলে পাথর,বালি, মাটি প্রভৃতি সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয়ে বাঁধ সৃষ্টি করলেও পরবর্তীতে জলের তোড়ে তা ভেঙে গিয়ে হড়পা বানের সৃষ্টি করে।
4. তুষার গলনের ফলে হঠাৎ প্রচুর জলরাশি সৃষ্টি হলে তা হড়পা বান সৃষ্টি করে।

হড়পা বানের জেরে বিপর্যস্ত সিকিম (2023)

4 অক্টোবর 2023-এ, ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিকিমের একটি রাজ্যের হিমবাহ দক্ষিণ লোনাক হ্রদ তার তীর ভেঙ্গে যায়, যার ফলে একটি হিমবাহী হ্রদ বিস্ফোরণে বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যা মধ্যরাতে চুংথাং-এর তিস্তা তৃতীয় বাঁধে পৌঁছেছিল, এর গেট খোলার আগেই, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁধটি ধ্বংস করে দেয়। তিস্তা নদীর নিচের দিকে পানির স্তর ২০ ফুট (৬.১ মিটার) পর্যন্ত বেড়েছে, যার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।1968 সালের সিকিম বন্যার পরে এটি এলাকার সবচেয়ে মারাত্মক বন্যা যখন প্রায় 1000 লোক মারা গিয়েছিল।

পটভূমি:
দক্ষিণ লোনাক হ্রদের একটি 2006 স্যাটেলাইট চিত্র, ওভারলেড রেখা সহ এর ছোট ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি দেখায় 2006-এর স্যাটেলাইট ছবি চার দশক ধরে হ্রদের সম্প্রসারণ দেখাচ্ছে দক্ষিণ লোনাক হ্রদ একটি মোরাইন-বাঁধযুক্ত হ্রদ যা লোনাক হিমবাহের গলিত জল দ্বারা খাওয়ানো হয়। 1962 সালের করোনা স্যাটেলাইট ছবিতে এটি প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি সুপারগ্লাসিয়াল হ্রদ হিসাবে। ল্যান্ডস্যাট এমএসএস চিত্রগুলি দেখায় যে এটি 1977 সালের মধ্যে একটি পৃথক হ্রদে পরিণত হয়েছিল, যার পৃষ্ঠতল 17 হেক্টর (42 একর) ছিল। চার দশকে, হিমবাহটি 1.9 কিলোমিটার (1.2 মাইল) পিছিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, হ্রদটি আকারে স্ফীত হয়ে 2008 সালের মধ্যে প্রায় 100 হেক্টর (247 একর) জুড়ে ছিল। এটিকে হিমবাহের বিস্ফোরণ বন্যার সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং 2018 সালে পাইপলাইনগুলি ইয়াক দ্বারা বাহিত হয়েছিল এবং এটি থেকে জল পাম্প করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। 28 সেপ্টেম্বর 2023 থেকে সেন্টিনেল-1A চিত্রগুলি দেখায় যে হ্রদটি 167.4 হেক্টর (414 একর) এলাকা জুড়ে রয়েছে।

বিপর্যয়ের কারণ:
1. গত কয়েক মাসে এই সব এলাকাগুলিতে অতিবৃষ্টি হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে ফল্টগুলিতে জল ঢুকেছে, তারপর আবার জল পড়ল। লাগাতার বর্ষণে মাটি নীচের ভারসাম্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। ফলে নানা প্রান্তে ধস দেখতে পাওয়া গেল। এদিকে মাটির তলার এই ফল্টগুলি কিন্তু যবে থেকে হিমালয় তৈরি হয়েছে তবে থেকেই আছে। কিন্তু, সম্প্রতি প্রাকৃতিক নানা কারণে ফল্টগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার হচ্ছে। এর একটা কারণ অবশ্যই ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কারণে কিন্তু অনেক সময় নতুন নতুন ফল্ট তৈরি হতে পারে। আগেরগুলি জায়গা পরিবর্তনও করতে পারে। জল ঢুকলেও এগুলির স্থান আবার অনেক সময় বদলাতে পারে। টানা বর্ষার কারণে আবার এই ফল্টগুলির জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। একটু চাপ পড়লেই ধসে যাচ্ছে মাটি। সে কারণেই বারবার এই ধরনের বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে।
2. সিকিম কিন্তু টেকটনিক্যাল ভাবে খুবই অ্যাকটিভ জোনে পড়ে। সহজ কথায়, সিকিমের মাটির তলাটা খুব একটা শক্ত নয়, নড়ছে। নড়ছে কারণ হিমালয় এখনও তৈরি হচ্ছে। সিকিম-সহ গোটা হিমালয়ান রিজিয়নে অনেক চ্যুতি বা ফাটল আছে। এই ফল্টগুলি শিরা-উপশিরার মতো মাটির নীচে রয়েছে। নীচের মাটি অসমান অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বৃষ্টি হলে এই ফল্টগুলি দিয়েই প্রচুর জল ঢুকে যায়। মাটি আরও নরম হয়। যখনই জল ঢোকে তখন যদি মাটি খানিকটা কেঁপে যায় তখন ফল্ট বরাবার মাটি ধসে নীচে নেমে যায়। এটাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলে মাস ওয়েস্টিং। মূলত এই কারণেই ধসগুলি নামে।

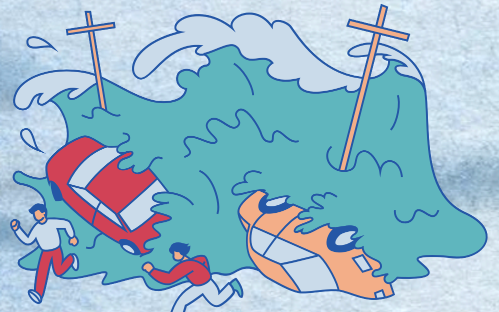

3. নদীর দুধারে যেমন বালি জমা পড়ে তেমনই গ্লেসিয়ার যখন যায় তখন তার দুধারে একধরনের জিনিস জমা পড়ে যার নাম মোরেন। এই মোরেনগুলি জমা হতে হতে স্তূপ হতে থাকে। ফলে গ্লেসিয়ার গলে যে জল তৈরি হয় সেটা এই মোরেনের মধ্যে আটকে থাকে। ফলে চাপ বাড়ে নদী বাঁধগুলিতে। এবার হঠাৎ একসঙ্গে অনেকটা গ্লেসিয়ার গলে গেলে বাঁধগুলিতে জলের ভারও অনেকটা বেড়ে যায়। এর ফলে মোরেনগুলি অনেক সময়ই ভেঙে যায়। ভেঙে যেতেই পুরো জলটা একধাক্কায় তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। এটাকে বলে গ্লেসিয়াস লেক আউব্রাস্ট। এরকমের ঘটনা রোজ কিন্তু হয় না। অনেকদিন অন্তর হয়। একটা বাঁধ ভাঙলে পরপর সব কটা বাঁধ ভাঙতে থাকে। ফলে একসঙ্গে অনেকটা জল বেরিয়ে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বন্যা:

2023 সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে, একটি মেঘ বিস্ফোরণের ফলে সিকিম তার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের দ্বিগুণেরও বেশি বৃষ্টিপাত করেছিল;[9] শুধুমাত্র 3 থেকে 4 অক্টোবরের মধ্যে, রাজ্যে স্বাভাবিকের পাঁচগুণ বৃষ্টিপাত হয়েছিল। দক্ষিণ লোনাক তার তীরে ফেটে যায়, যার ফলে আকস্মিক বন্যা হয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার RISAT-1A থেকে স্যাটেলাইট চিত্রগুলি দেখায় যে হ্রদের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 100 হেক্টরেরও বেশি (247 একর) সঙ্কুচিত হয়েছে। মধ্যরাতে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের একটি সতর্কতার ভিত্তিতে, চুংথাং-এ তিস্তা তৃতীয় বাঁধের অপারেটররা বাঁধের গেট খুলতে ছুটে আসেন, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যায়; বন্যা দ্রুত বাঁধ ধ্বংস করে, সেইসাথে তার 1200-মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ পাওয়ার হাউসের সেতু, যা নিমজ্জিত হয়েছিল।

তিস্তা নদীর নিচের দিকে পানির স্তর পরবর্তীকালে 15 থেকে 20 ফুট (4.6 থেকে 6.1 মিটার) বেড়েছে, সিকিমের মাঙ্গান, গ্যাংটক, পাকিয়ং এবং নামচি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে।বন্যা বাংলাদেশেও চলে যায়, যেখানে তিস্তা নদী ও চর এলাকায় শত শত গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজ্য জুড়ে পনেরটি সেতু ভেসে গেছে, এবং রাজ্যের উত্তর, রাজধানী গ্যাংটক সহ, ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ ন্যাশনাল হাইওয়ে 10-এর কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। রাজ্য জুড়ে তিন হাজার পর্যটক আটকা পড়েছিলেন। চুংথাং, ডিকচু, সিংটাম, রংপো, মেলি এবং তিস্তা বাজারের মতো শহর ও শহরগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

সিকিমের আকস্মিক বন্যার কিছু দৃশ্য

ত্রাণ কার্যক্রম:

সিকিম সরকার বন্যাকে একটি দুর্যোগ ঘোষণা করেছে এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে ₹48 কোটি ($5.76 মিলিয়ন) ছেড়েছে। যারা মারা গেছে তাদের পরিবারকে 4 লক্ষ ($4804), সেইসাথে ত্রাণ শিবিরে থাকাদের জন্য ₹2,000 ($24) তাৎক্ষণিক অর্থ প্রদান। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী চলমান ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে দুই হাজার চারশত লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৭,৬০০ জন ত্রাণ শিবিরে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আরও দশ হাজারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিধ্বস্ত তিস্তা তৃতীয় বাঁধের টানেলের ভেতরে ১৪ জন আটকা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে; ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের একটি 60-শক্তিশালী দল - স্কুবা ডাইভার সহ - তাদের উদ্ধারের জন্য একত্রিত হয়েছিল।

সিকিমের আকস্মিক বন্যার কিছু দৃশ্য

তথ্যসূত্র:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_flood
2. https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-bengali/flash%20flood
3. https://tv9bangla.com/kolkata
4. https://ndma.gov.in/

পরেশের আত্মা

ANKITA MAJUMDER, 4TH SEMESTER

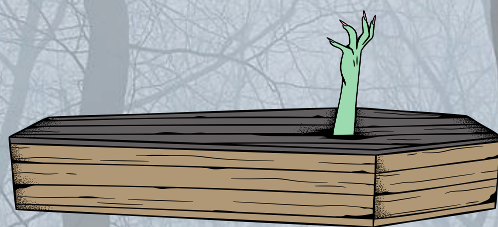

আজকে যে ঘটনাটি বলব তা ঘটেছিল প্রায় ২৫-৩০ বছর আগে...আমার বড় মামা দিরাজপুর নামক এক গ্রামে বাস করে , মামা প্রতিদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হেঁটে শহর এলাকায় কাজ করতে আসে। তিনি খুব সাহসী ও পরিশ্রমী। বড় মামা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাজের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হতো। তখন গ্রামের রাস্তা পাকা ছিল না আর এখন কার মতো গাড়ি রাস্তায় চলাচল করতো না তাই মামা হেঁটে শহরে কাজে যেত । আবার শহর থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত ,আর এভাবে কষ্টে জীবন চলছিল তার। প্রতিদিনের মত একদিন কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলো ,তখন ছিল শীতকাল। সেদিন খুব বেশি ঠান্ডা পড়ছিলো তার সাথে কুয়াশা পড়ে চারিদিক তেমন ভালো দেখা যাচ্ছে না , মামা চাদর গায়ে জড়িয়ে ধুলো মাখা পথে হেটে বাড়ি যাচ্ছিলো। রাত তখন বেশি হয়নি কিন্তু শীতের রাত তাই কেউ বাইরে নেই,মাঝে মাঝে দূর থেকে শিয়াল এর করুন সুর ভেসে আসছে। হঠাৎ মামার মনে হয় তার চলার পথের কিছুটা সামনে সাদা কাপড়ে মোড়ানো এক মৃতদেহ যেন শুয়ে আছে ,কিন্তু ঘন কুয়াশার কারনে সে ভালো করে দেখতে পেলো না তবে ওটা যে সাদা কিছু হবে তা বুঝতে পারলো। সে ভয় না পেয়ে সামনের দিকে হাটতে লাগলো কিন্তু লাশটা যেন তার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মামা ছিল খুব সাহসী তাই সে চিন্তা করলো সামনের সাদা জিনিস টা কি তা দেখবে। কোনো মানুষ নাকি অন্যকিছু । মামা যত সামনে এগিয়ে যায় লাশটাও সামনেই থাকে সামনে থেকে কিছুতেই দূর হচ্ছে না তখন মামার মনে কিছুটা ভয় অনুভব করছে। এভাবে কিছু দূর যাওয়ার পর সে সাদা জিনিস টা কে স্পষ্ট দেখতে পেলো আর তখন যা দেখলো,, একটা সাদা কাপড়ে মোড়ানো লাশ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে , মামার হাত পা তখন যেন স্থির হয়ে শরীর ঘামতে শুরু করলো। সে তখন চিন্তা করলো সামনের দিকে এগিয়ে যাবো নাকি পিছিয়ে দৌড় দিবো। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব সাহসী তাই বুকে সাহস নিয়ে এক পা দুপা করে সামনের দিকে এগোতে লাগলো , চোখের পলকে হঠাৎ লাশটি উধাও হয়ে গেলো,, মামা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো আর কোনোদিক না তাকিয়ে জোরে জোরে সামনের দিকে হাটতে শুরু করলো।

এখানেই শেষ নয় কিছু দূর যেতে আবার সেই লাশটা মামার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লো ঠিক আগের মত করে, মামা চিন্তা করলো এখন সে বাড়ি যাবে কি করে „রাস্তার আসে পাশে কোনো বাড়িও নেই যে সেই বাড়িতে আজকের রাত টা আশ্রয় নেবে ,তবে কিছুটা দূরে একটা ছোট দোকান আছে আর দোকানদার সেই দোকানেই রাতে শুয়ে থাকে „তাই সে চিন্তা করলো যে ভাবেই হোক ওই দোকান পর্যন্ত তাকে যেতেই হবে । এরপর রামনাম করতে করতে যখন মামা দোকান পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তৎক্ষণাৎ দোকানদার কে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করলো , মামার ডাক শুনে কিছুক্ষন পর দোকানদার দোকানের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আর মামার উপর রাগান্নিত হয়ে বললো „এই আপনি এতো রাতে ডাকা ডাকি করছেন কেন ? মামা তখন বললো ভাই আগে আমাকে আপনার দোকানে আশ্রয় দেন পরে সব আপনাকে বলছি ,পরে দোকানদার মামা কে সেই রাতের জন্য তার দোকানে আশ্রয় দেয়।পরে মামা ওই দোকানদারকে সব কথা খুলে বলে এবং দোকানদার বলে ওটা পরেশ ভূতের আত্মা„যাকে সম্পত্তির লোভে তার দাদা বেশ কয়েক বছর আগে মেরে ফেলে এবং সমাজের কাছে আত্মহত্যার রূপ দেয়। তাকে দাহ করাতে নিয়ে যাবার সময় অদ্ভুতভাবে তার লাশ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এবং তারপর থেকেই পরেশের আত্মা ওই রাস্তায় ঘোরাফেরা করে। এইসব কথা শুনে মামার যেন প্রাণটাই বেরিয়ে আসে। এবং ওই রাতটুকু ওই দোকানদারের সঙ্গেই কোনরকমে কাটিয়ে দেয় । এর পর সকাল হলে মামা বাড়ি ফিরে যায় তার পর সে শহরের কাজ টাও ছেড়ে দেয়।এবং প্রতিজ্ঞা করে কোনোদিন রাতে ওই পথ দিয়ে চলাচল করবে না।

Shreya Bhatta
6th Sem

NANDITA BHOWMIK
6TH SEM

PRITHA TALUKDER
6TH SEM

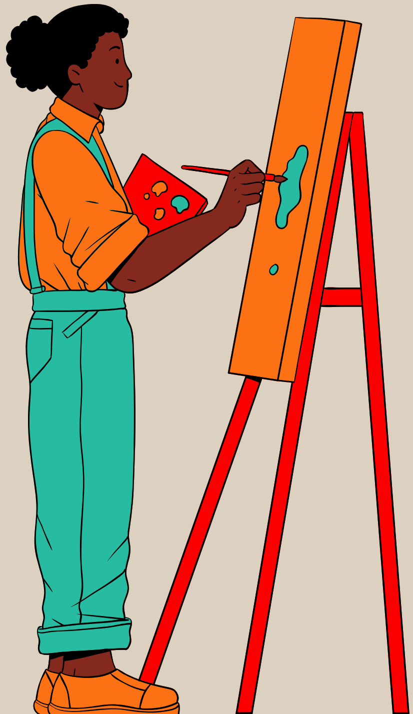

JOYEETA MANDAL
2ND SEM

DEEPA SAHA 6TH SEM

DEEPA SAHA
6TH SEM

AMBIKA BHADRA 2ND SEM

MOONLIT NIGHT

PRIYANKA SAHA 6TH SEM

RIYA MANDAL
6TH SEM

APARUPA SAHA
6TH SEM

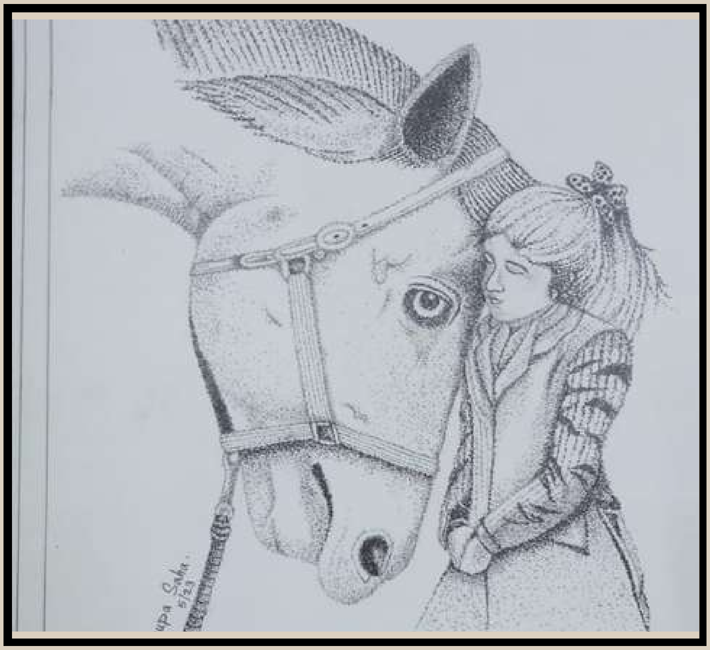

JAYEETA MANDAL
2ND SEM

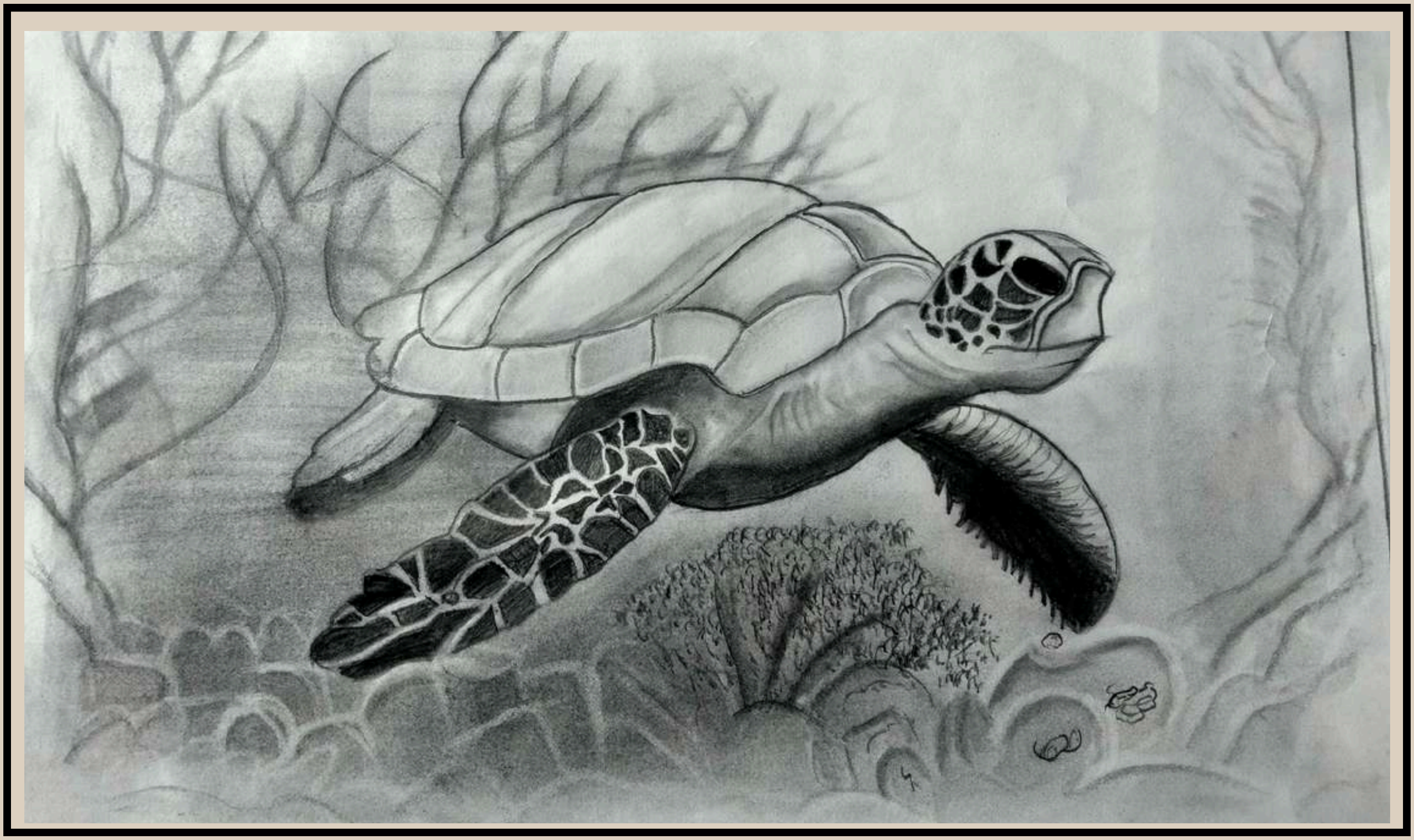

EXPLORE

MAHIMA DEBNATH 6TH SEM

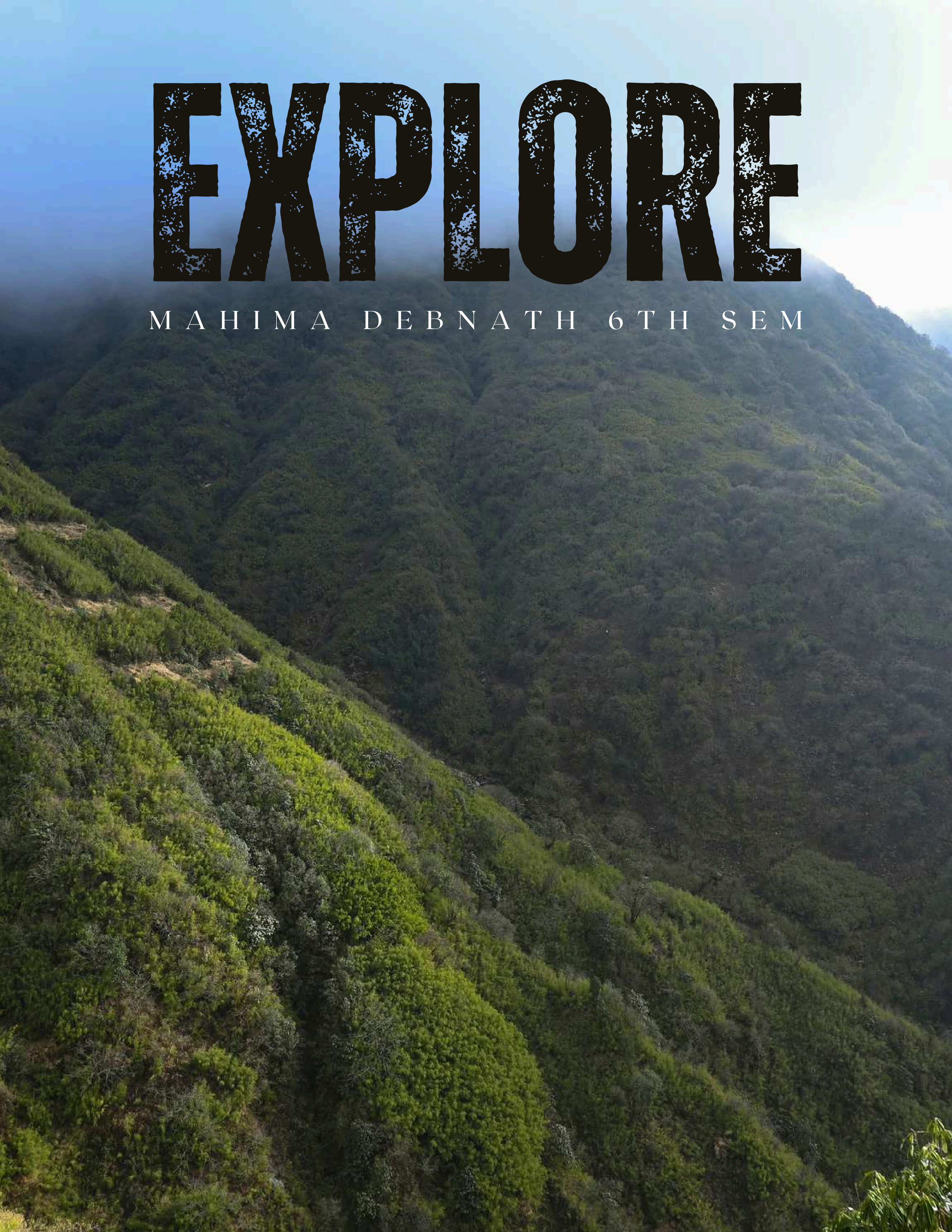

OPACAROPHILE

KOYEL SARKAR
4TH SEM

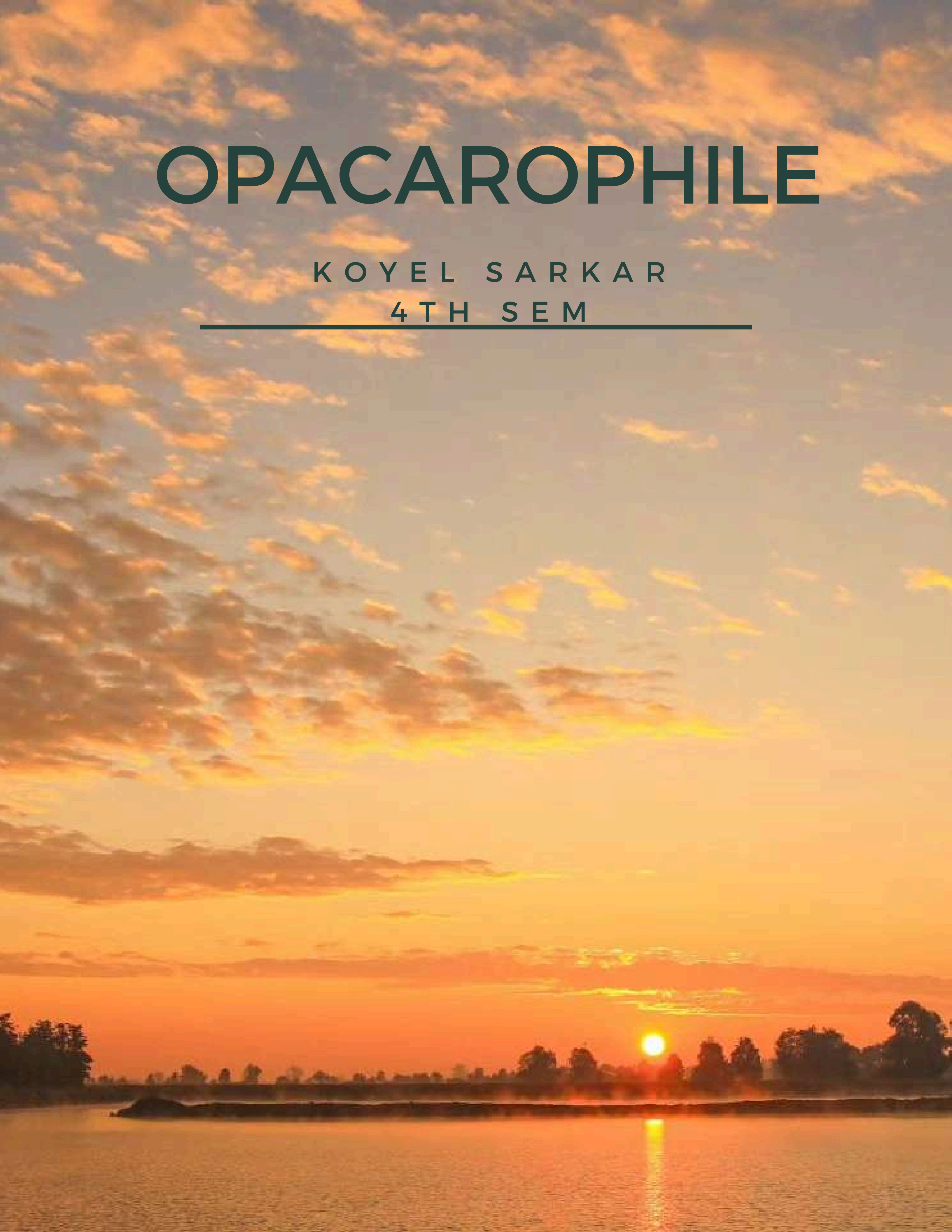

“THE MAGIC OF MUSHROOMS NEVER FADES.”

RIYA SARKAR 6TH SEM

SHOWCASING THE SKY'S EPHEMERAL BEAUTY

SONIA BARMAN 4TH SEM

Tradition

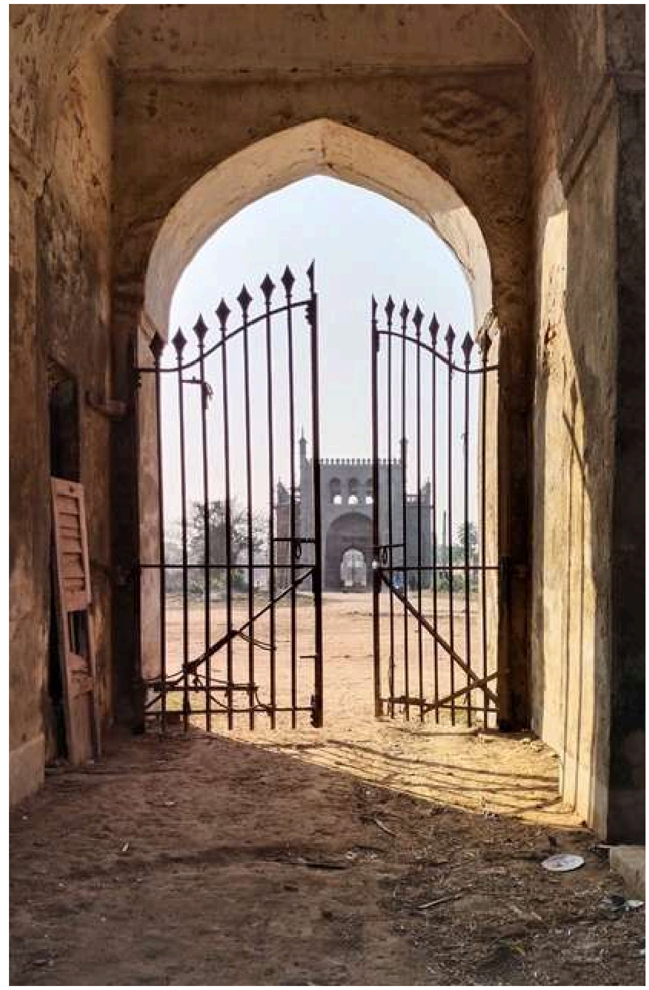

RIYA MANDAL 6TH SEM

SUNDOWN SERENITY

RAJASHREE ROY KARMAKAR
4TH SEM

LINA KHATUN 4TH SEM

PIYASHI GARAI 6TH SEM

Appreciation from Media

নদী রক্ষায় উদ্যোগী কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর

এতদিন জেলার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে জলঙ্গির পাশাপাশি জেলার অন্যান্য নদী বাঁচানোর জন্য নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ।

জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ নদীকে তার স্বাভাবিক গতিধারা ফিরিয়ে দিতে কলেজের পড়ুয়াদের সক্রিয় হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর তাঁদের সচেতন করতে আয়োজন করা হল আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেমিনারে অংশ নেন একাধিক দেশের নদী বিশেষজ্ঞরা। শনিবার জলঙ্গি দিবস উপলক্ষে কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ ও 'সেভ জলঙ্গি'র যৌথ উদ্যোগে, কলেজে "মুমূর্ষু নদী ও জলাভূমির পুনরুজ্জীবন: সুস্থিত ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনার উন্মোচন" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে নদী এবং জলাভূমির অস্তিত্বের সংকট এবং তার প্রতিকারের বিষয় ছিল এই সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয়।

সেমিনারে স্থায়ী বিকাশের উপর জোর দেওয়া, বাস্তুতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব এবং মানব সভ্যতার উপর সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পল মার্শ এবং বাংলাদেশের আক্রাম হোসেনের মতো বক্তারা সেমিনারে 'ভার্চুয়াল' অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নদী বিশেষজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, জলপুরুষ শ্রী রাজেন্দ্র সিংহ, স্নেহাল দত্তে, আজনারুল ইসলামও সেমিনারে 'ভার্চুয়াল' অংশগ্রহণ করেন।

কল্যাণ রুদ্র বলেন, "নদীমাতৃক বাংলাদেশের উর্বর পলিতে অত্যন্ত ভাল ফসল ফলার কারণে মোগল যুগে বাংলাকে 'ভারতের স্বর্গ' বলা হতো। জলঙ্গি নদীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ভূ-প্রাকৃতিক কারণে এই নদী আজ মরণাপন্ন। ভূ-প্রাকৃতিক বিষয় আমাদের হাতে নেই। তবে দূষণ আটকে নদীকে স্বাভাবিক ভাবে বইতে দিলে নদীর আয়ু আরও কিছুদিন বাড়বে। তাতে উপকৃত হবেন নদী পাড়ের মানুষ।"

স্নেহাল দত্তে বলেন "প্রচুর খরচ করে আধুনিক এসটিপি-র বদলে প্রাকৃতিক উপায়ে (ব্যাকটেরিয়া কালচার) দূষিত জল শোধন করা সম্ভব। যা সাশ্রয়কর এবং সুস্থায়ী বিকাশের নিদর্শন হতে পারে।"

কলেজের অধ্যক্ষা নাতাশা দাশগুপ্ত বলেন, "মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে নদীকেও রক্ষা করতে হবে। আমাদের কলেজের মেয়েরা যাতে নদীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নদীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে, তার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।"

এ দিন কৃষ্ণনগরের জলঙ্গি নদীর নিরঞ্জন ঘাটে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'সেভ জলঙ্গি'।

D10

আনন্দবাজার পত্রিকা 19.02.24

কলম

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ

শফিকুল ইসলাম, নদিয়া

সরকারি পরিষেবা এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রচারের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন স্থানে উপলব্ধ রয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পেতে পারবেন। বুধবার কৃষ্ণনগর সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা হাতে কলমে দেখেন কীভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিদ্যুৎসংযোগ, কাস্ট সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সবধরনের ফর্ম পূরণ কিংবা তথ্য জানার সুবিধা পাওয়া যায়। এর জন্য সাইবার ক্যাফেতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কনভেনার সাবির আহমেদ জানান, 'সাধারণত সরকারি সুবিধা পেতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন সরকারি দফতরে ছোটাছুটি করতে হয়। এর ফলে হয়রানির শেষ থাকে না। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু হয়েছে।'

কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজের এক [illegible] জানান, 'ড্রাইভিং লাইসেন্স [illegible] তাঁকে দালালের পাল্লায় [illegible]। কিন্তু বাংলা [illegible] দালালের পাল্লায় পড়তে হবে না।'

এদিন ওই কলেজের ছাত্রীদের কৃষ্ণনগরের জেলাশাসক, মহকুমা শাসকের দফতর ও জেলাপরিষদে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয় কীভাবে সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ হচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পেতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হয়, তা হাতে কলমে দেখানো হয়। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের পরিষেবা পাওয়া যায়। তবে আধার সংক্রান্ত কাজ হয় না। সেই বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ রয়েছে। ফলে সেই সমস্যারই সমাধান হতে চলেছে। এবার বাংলা সহায়তা কেন্দ্রেই (বিএসকে) মিলবে আধার সংক্রান্ত যাবতীয় [illegible]

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুমতি দিয়েছে রাজ্যকে। লক্ষ্মীরভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বিবিধ পেনশন সহ যাবতীয় তথ্য কিংবা ফর্মও এই বিএসকেগুলিতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিল পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। এদিন কৃষ্ণনগরে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের রাজ্যের চিফ অপারেটিভ অফিসার সাদিয়া আজিম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিএসকে রয়েছে। যুবদের কাছে যেহেতু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সুবিধা আছে, তাই যুবদের সচেতন করতে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সব জেলাতেই উৎসাহ দেওয়া ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য [illegible] করছি। এদিন সঙ্গে ছিলেন [illegible] সহায়তা কেন্দ্রের [illegible]

সরকারি পরিষেবা মিলবে কীভাবে, প্রশিক্ষণ বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র নিয়ে কর্মশালা

কৃষ্ণনগর

সই জালে অভিযুক্ত ব্লকের কর্মী

বিজেপি নেতাকে খুনের অভিযোগ

প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়াই স্বপ্ন রিয়ার

মান নিয়েই প্রশ্ন, রাস্তার কাজ বন্ধ

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

A FEW GLIMPSES OF OUR BEST PRACTICES

IN OUR CHANGING WORLD NOTHING CHANGES MORE THAN GEOGRAPHY
-PEARL S. BUCK
Thank You